

সরল বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত।

[*Vide Notification No. Syl./48/55, dated the 17th October, 1955 ; Calcutta Gazette, the 10th November, 1955*]

সরল বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, পশ্চিমবংগ শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিষ্ট্রার

স্নেহময় দত্ত

এম্. এস্-সি, পি. আর্. এস্. (কলিকাতা), ডি. এস্-সি. (লণ্ডন), ডি. আই. সি. (লণ্ডন), এফ. এন্. আই.

ও

সিটি কলেজের উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক
উদ্ভিদ্-বিদ্যা, সরল জীব-বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এস্-সি.

প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

C.E.R.T West Bengal
Date ...
Acc. No. 5676
5776
৮৮৪

পুনর্মুদ্রণ—১৯৬১

S/E/9479

মূল্য এক টাকা আটত্রিশ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

Govt. of West Bengal
STATE INSTITUTE OF EDUCATION

দ্বিতীয় অধ্যায়
জল

তৃতীয় অধ্যায়
শক্তি

চতুর্থ অধ্যায়

জীবের কথা

সরল বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

বায়ু (Air)

ভূ-পৃষ্ঠের চারিদিকে বায়ুর একটা আবরণ আছে। ইহাই বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর আকর্ষণে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে। উহা ঊর্ধ্বে প্রায় ছয় শত হইতে সাত শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা এই বায়ুসমুদ্রের তলদেশে বাস করি।

বায়ু কি দিয়া গঠিত? (Air is made of what?)

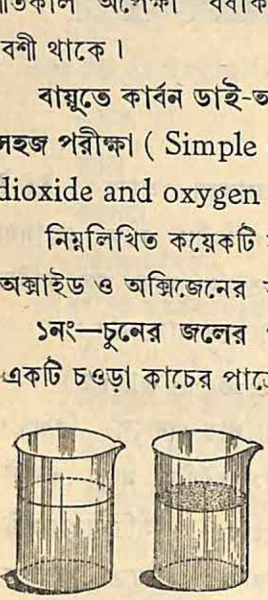
বায়ু কয়েকটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বচ্ছ গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ। ইহাতে দুইটি প্রধান গ্যাস আছে। এই গ্যাস দুইটির মধ্যে একটি সক্রিয় (active) ও অপরটি নিষ্ক্রিয় (inactive)। সক্রিয় গ্যাসটি নিজে জ্বলে না কিন্তু সকল দাহ্য বস্তুকে জ্বলিতে সাহায্য করে এবং ইহার সাহায্যে সকল জীব শ্বাসকার্য করিয়া থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি জ্বলনের কার্যে বা শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না, তবে উহাদের তীব্রতা কমাইয়া দেয়, নতুবা সকল বস্তু তাড়াতাড়ি পুড়িয়া যাইত। বায়ুর ঐ সক্রিয় অংশকে অক্সিজেন (Oxygen) ও নিষ্ক্রিয় অংশকে নাইট্রোজেন (Nitrogen) বলে। নিষ্ক্রিয় অংশে নাইট্রোজেন ব্যতীত সামান্য পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide) ও হিলিয়াম (Helium), আর্গন (Argon) প্রভৃতি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প (Water vapour) বর্তমান আছে।

বায়ুতে এই সকল উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। স্থান ও সময় বিশেষে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সমুদ্রের ধারে ও পাহাড়ের উপরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। বড় বড় শহরে ও খনির মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয়। শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে।

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের অস্তিত্ব জানিবার সহজ পরীক্ষা (Simple experiments for detecting carbon dioxide and oxygen in the air)—

নিম্নলিখিত কয়েকটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়ঃ—

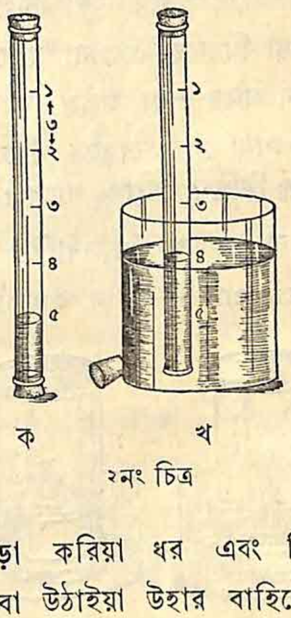
১নং—চুনের জলের পরীক্ষা (Lime water experiment)—একটি চওড়া কাচের পাত্রে খানিকটা চুনের জল লইয়া উহাকে এক স্থানে রাখিয়া দাও (১নং চিত্র—ক)। কয়েকদিন পরে দেখিবে যে, ঐ চুনের জলের উপরে একটি সাদা সর পড়িয়াছে (১নং চিত্র—খ)। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত চুনের জলের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate) বা খড়িমাটি (chalk) উৎপন্ন হইয়াছে। খড়িমাটি জলে দ্রবীভূত হয় না বলিয়া উহা সাদা সরের মত ভাসিতে থাকে। আরও লক্ষ্য করিবে, চুনের জল কিছু ঘোলাটে হইয়াছে। এই পরীক্ষা দ্বারা বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়।



ক খ

১নং চিত্র

২নং—ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেটের পরীক্ষা (Alkaline pyrogallate experiment)—একটি ১৮ ইঞ্চি লম্বা দুই মুখ খোলা কাচের নল এবং উহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য দুইটি ছিপি লও। নলটিকে সুতা বা রবারের পাঁচটি আংটার সাহায্যে সমান ছয় ভাগে ভাগ কর। এখন ছিপি দিয়া নলের নীচের মুখ বন্ধ কর এবং খাড়া করিয়া ধরিয়া উহার মধ্যে সদ্য-তৈয়ারী ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ (Alkaline pyrogallate solution)* ঢালিয়া এক ভাগ পূর্ণ কর (২নং চিত্র—ক); সুতরাং বাকি পাঁচ ভাগ বায়ু আছে। নলের উপরের মুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া উহাকে ভাল করিয়া ঝাঁকাও। দেখিবে, ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণের রং বাদামি হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ অক্সিজেন শোষণ করিয়াছে। এইবার নলের নীচের মুখ একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে খাড়া করিয়া ধর এবং ছিপিটি খুলিয়া ফেল। নলকে নামাইয়া বা উঠাইয়া উহার বাহিরের ও ভিতরের জলতল সমান কর। এখন দেখ, জলতল নীচ হইতে দ্বিতীয় দাগ পর্যন্ত উঠিয়াছে (২নং চিত্র—খ) অর্থাৎ নলের বাকি পাঁচ ভাগের এক ভাগ জলে পূর্ণ হইয়াছে।

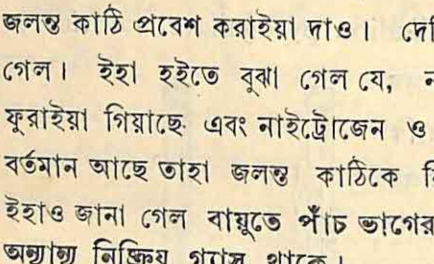


২নং চিত্র

* ঘন কষ্টিক পটাশ (Caustic potash) দ্রবণে খানিকটা পাইরো-গ্যালিক অ্যাসিড (Pyrogallic acid) ঢালিলে এই দ্রবণ প্রস্তুত হয়।

ইহার কারণ কি ? কারণ পাঁচ ভাগ বায়ুর মধ্যে যেটুকু অক্সিজেন ছিল তাহা ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্বারা বিশোষিত হইয়াছে এবং এই শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য জল নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং জানা গেল **বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন।** এখন বাকি চারি ভাগে কি গ্যাস আছে দেখা যাউক। নলের উপরের ছিপি খুলিয়া তাড়াতাড়ি নলের মধ্যে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে, উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, নলমধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেন ফুরাইয়া গিয়াছে এবং নাইট্রোজেন ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস যাহা বর্তমান আছে তাহা জলন্ত কাঠিকে নিভাইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহাও জানা গেল **বায়ুতে পাঁচ ভাগের চারি ভাগ নাইট্রোজেন ও অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে।**

৩নং—জলন্ত মোমবাতির পরীক্ষা (Burning candle experiment)—কোন কাচপাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া একটি মোমবাতি দাঁড় করাইয়া জ্বালাইয়া দাও। এইবার একটি জার দিয়া উহাকে ঢাকিয়া দাও। লক্ষ্য কর, জারের ভিতরের ও বাহিরের জল এক সমতলে আছে (৩নং চিত্র—ক); জারের যে অংশ জলতলের উপরে আছে তাহা পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ করিয়া চিহ্নিত কর। মোমবাতিটি কিছুক্ষণ জ্বলিয়া উহার শিখা ক্রমশঃ ছোট হইয়া নিভিয়া গেল। এখন দেখ, জল জারের ভিতরে এক দাগ উপরে



ক খ

৩নং চিত্র

উঠিয়াছে (৩নং চিত্র—খ) ; অর্থাৎ জারের ভিতরের বদ্ধ বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ জলে পূর্ণ হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মোমবাতি জ্বলিবার ফলে জারের ভিতরের বদ্ধ বায়ুর $\frac{1}{5}$ অংশ অক্সিজেন নিঃশেষিত হইয়াছে এবং ঐ শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য জলপাত্রের জল জারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ফলে জারের ভিতরের জল বাইরে জল-সমতল থেকে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এখন জারের মুখ একটি চাকতি দিয়া বন্ধ করিয়া জল হইতে তুলিয়া উল্টাইয়া রাখ। এইবার চাকতিটি সরাইয়া তাড়াতাড়ি একটি জলন্ত কাঠি জারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখ, উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। সুতরাং জানা গেল জারের ভিতরের অবশিষ্ট $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি আছে।

প্রধানতঃ বায়ুর আয়তনের $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন এবং সামান্য পরিমান কার্বন ডাই-অক্সাইড সমেত বাকী $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন (Air contains mainly $\frac{1}{5}$ volume oxygen and $\frac{4}{5}$ volume inactive gas namely nitrogen including traces of carbon dioxide)—

পূর্বোক্ত পরীক্ষা দুইটি (২নং ও ৩নং পরীক্ষা) হইতে তোমরা জানিতে পারিয়াছ যে বায়ুর আয়তনের প্রায় $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন এবং বাকি $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিমাণ খুবই সামান্য।

শ্বাসকার্য (Respiration)

বায়ুর সহিত জীবের সম্পর্ক (The air in relation to living objects)—খাদ্য ও জলের অভাবে জীব কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বায়ুর অভাবে কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচিতে পারে না। জীবের শ্বাসকার্যের জন্য বায়ুর অক্সিজেনের বিশেষ

আবশ্যক। **শ্বাসগ্রহণ** বা **প্রশ্বাস** (inhalation) এবং **শ্বাসত্যাগ** বা **নিঃশ্বাস** (exhalation)—এই উভয় কার্যকে শ্বাসকার্য বলে। জীবের এই শ্বাসকার্য দিবারাত্রি চলে।

প্রশ্বাসের সময় আমরা নাসিকার ছিদ্র দিয়া (সময়ে সময়ে মুখ দিয়া) অক্সিজেনপূর্ণ বায়ু ফুসফুসের মধ্যে টানিয়া লই। দেহের যাবতীয় দূষিত রক্ত শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ফুসফুসের অতি সূক্ষ্ম জালক নালীতে (capillaries) উপস্থিত হয়। এইস্থানে অক্সিজেন এবং দূষিত রক্তমধ্যস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের আদান-প্রদান হইয়া রক্তের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া যায় অর্থাৎ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। বিশুদ্ধ রক্তের সহিত অক্সিজেন দেহের সকল স্থানে যাইয়া খাদ্যের উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে তাপ সৃষ্টি হয় উহা দেহের উষ্ণতা ও কার্য করিবার শক্তি প্রদান করে।

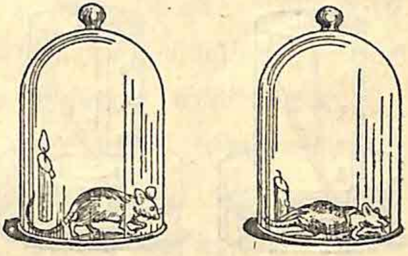
আমাদের মত সকল মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্থলচর প্রাণী ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে। মাছেরা ফুলকার (gills) সাহায্যে শ্বাসকার্য করে। ইহারা মুখ দিয়া জল লইয়া কানকুয়ার (operculum) পাশ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই সময় ফুলকার রক্ত জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এইজন্য মাছকে ক্রমাগত মুখ ও কানকুয়া নাড়িতে দেখা যায়। পতংগ বায়ু-নল (air-tube) দিয়া এবং কেঁচো ত্বকের ছিদ্র দিয়া শ্বাসকার্য করে। উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের জন্য বিশেষ কোন শ্বাসযন্ত্র নাই, দেহের সকল অংশ দিয়া শ্বাসকার্য হইয়া থাকে। জলজ

উদ্ভিদ্ জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং জলের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে।

বায়ুর অক্সিজেন অভাবে জীবের শ্বাস রুদ্ধ হয় (Living objects suffocate in air without Oxygen)—

বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব হইলে কোন জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা ইহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে—

৪নং পরীক্ষা—টেবিলের উপর একটি জলন্ত মোমবাতি রাখ এবং উহার উপর একটি বেলজার (belljar) চাপা দাও। এখন তাড়াতাড়ি করিয়া উহার মধ্যে একটি ছোট ইঁদুর ছাড়িয়া দাও (৪নং চিত্র—ক) এবং বেল-জারের কিনারা বরাবর খনিজ মোম ও তার্পিণ তৈল লাগাও যাহাতে বাহিরের সামান্য বায়ুও উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।


ক খ

৪নং চিত্র

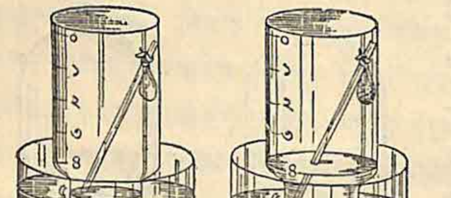
বেলজারের ভিতরের আবদ্ধ বায়ুর সমস্ত অক্সিজেন নিঃশেষিত হইবার পরে মোমবাতিটি নিভিয়া যাইবে। বাতি নিভিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে যে, ইঁদুরটির শ্বাসকষ্ট হইতেছে এবং শীঘ্রই অক্সিজেন অভাবে ইহা ছটফট করিয়া মরিয়া যাইবে (৪নং চিত্র—খ)।

লোহার মরিচা-ধরা (Rusting of iron)

তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে কোন লোহার জিনিষ কয়েকদিন জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুতে পড়িয়া থাকিলে উহাদের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং গায়ে একটা লাল রঙের আবরণ পড়ে। এই আবরণকে আমরা

মরিচা (rust) বলি এবং প্রক্রিয়াকে **মরিচা-ধরা** (rusting) বলি। এই মরিচা বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক সংযোগের ফলেই উৎপন্ন হয়। মরিচা-ধরা একপ্রকার মৃদু দহন। ইহাতে আগুনের দরকার হয় না। সুতরাং তাপ বা আলোক বাহির হয় না, কিন্তু বায়ুর সক্রিয় অংশ অক্সিজেনের যে প্রয়োজন হয় এবং ধাতুর ওজন বাড়িয়া যায়, তাহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

৫নং পরীক্ষা—এক টুকরা ভিজা কাপড়ে জানা ওজনের কয়েকটি চকচকে লোহার টুকরা বাঁধ। এবার ঐ পুঁটলিটি একটি কাচদণ্ডের আগায় বাঁধিয়া ঐ কাচ-দণ্ডটি একবার জলপূর্ণ পাত্রের উপর খাড়া করিয়া ধর এবং উহার উপর একটি কাচের বোতল উপুড় করিয়া দাও (৫নং চিত্র—ক)। লক্ষ্য করিয়া দেখ, বোতলের ভিতরের ও বাহিরের জল এক সমতল আছে। বোতলের জলের সমতল হইতে উপরের বায়ুপূর্ণ অংশটি সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া দাগ দাও। এই অবস্থায় বোতলটি কয়েক দিনের জন্য একস্থানে রাখিয়া দাও। কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইবে যে, বোতলের ভিতরের জল ৪নং দাগে উঠিয়া গিয়াছে (৫নং চিত্র—খ)। কত উঁচুতে উঠিয়াছে, তাহা মাপিলে দেখিতে পাইবে যে, বায়ুপূর্ণ অংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জলে ভরিয়া গিয়াছে। এইবার বোতলটির মুখ একটি চাকতি দিয়া বন্ধ করিয়া



ক খ

৫নং চিত্র

জল হইতে তুলিয়া উল্টাইয়া রাখ। এখন চাকতিটি একটু সরাইয়া উহার ভিতরে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখ, উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গেল। পুঁটলি হইতে লোহার টুকরাগুলি খুলিয়া দেখ উহাতে মরিচা ধরিয়াছে। ওজন করিয়া দেখ, উহার ওজন আর পূর্বের মত নাই, একটু বাড়িয়াছে।

এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, লোহার টুকরাগুলির সঙ্গে অক্সিজেনের যোগ হইয়াছে এবং তাহারই ফলে উহাদের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। বোতলের ভিতরকার অক্সিজেনের ভাগ কমিয়া যাওয়াতে জল ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ভিতরে গ্যাসীয় পদার্থ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা একেবারে নিষ্ক্রিয়; সুতরাং জলন্ত কাঠি প্রবেশ করান মাত্রই উহা নিভিয়া গেল। মরিচা-ধরা টুকরাগুলি এখন আর লোহা নয়। চুম্বক উহাদিগকে আকর্ষণ করে না। অক্সিজেনের যোগে লোহা এক নূতন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ইহাই লৌহের অক্সাইড (Iron oxide)।

মরিচা-ধরার জন্য অক্সিজেন ও জল বা জলীয় বাষ্প দরকার (Rusting needs both oxygen and water)—

তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি যে, লোহার মরিচা-ধরার জন্য অক্সিজেন ও জল বা জলীয় বাষ্প দরকার। ইহা তোমরা নিম্নলিখিত দুইটি পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারিবে—

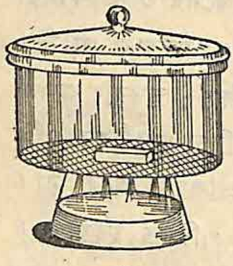


৬নং চিত্র

৬নং **পরীক্ষা**—কোন পাত্রে কিছু জল লইয়া ফুটাও। দেখিবে জল হইতে বুদ্‌বুদ্‌ বাহির হইতেছে। ইহার কারণ জলের মধ্যে যে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তাহা তাপে বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন এই জল ঠাণ্ডা হইবার পর

উহা একটি চওড়া মুখযুক্ত কাচের জারে পূর্ণ কর। এইবার জারের মধ্যে একটি চকচকে লোহার টুকরা ফেলিয়া দিয়া মুখ বন্ধ কর (৬নং চিত্র)। কিছুদিন পরে লোহার টুকরাটি জল হইতে বাহির করিয়া দেখ, ইহা আগেকার মত চকচকে আছে কোনও মরিচা ধরে নাই। সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, **মরিচা-ধরার জন্য অক্সিজেন দরকার।**

৭নং পরীক্ষা—৭নং চিত্রানুযায়ী একটি কাচপাত্র লও। ইহার নীচের অংশে খানিকটা সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric acid) রাখ। ইহা জলীয় বাষ্প শোষণ করে, সুতরাং কাচ-পাত্রের মধ্যে কোনও জলীয় বাষ্প নাই। এখন একটি চকচকে লোহার টুকরা ঐ কাচ পাত্রের জালের উপর রাখ। বহুদিন পরেও দেখিবে যে, লোহার টুকরাটি আগেকার মত চকচকে আছে, কোন মরিচা ধরে নাই। সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, **মরিচা-ধরার জন্য জলীয় বাষ্প দরকার।**



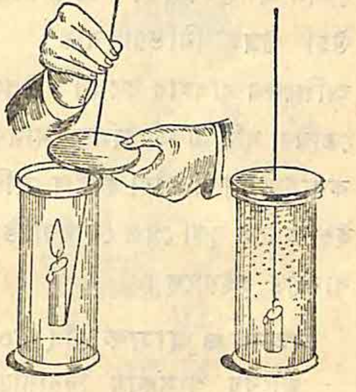
৭নং চিত্র

দহন (Combustion)

কাঠ, কয়লা, কাগজ, মোমবাতি, তৈল প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযোগে জ্বলিতে থাকে। ইহাদিগকে **দাহ্য বস্তু** (combustible substance) বলে। জ্বলনের সময় দাহ্য বস্তুর সহিত বায়ুর অক্সিজেনের যে দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং যাহার ফলে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় তাহাকে সাধারণতঃ **দহন** বলে। তবে আলোক ও তাপ উৎপন্ন হইলেই দহন হয় না। একটি সরু তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিলে তাপ ও আলোক সৃষ্টি

হয় বটে, কিন্তু ইহা দহন নহে, কারণ দহনের সময় রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি পদার্থ, যথা—ফস্‌ফরাস (phosphorus), আর্সেনিক (arsenic) প্রভৃতি ক্লোরিণ গ্যাসের মধ্যে রাখিলে উহারা জ্বলিতে থাকে, অক্সিজেনের কোন দরকার হয় না। **সুতরাং যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোক ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহাকে দহন বলে।**

মোমবাতি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতিতে কার্বন ও হাইড্রোজেন থাকে। দহনের সময় এই কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়। তোমরা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে—



৮নং চিত্র

৮নং **পরীক্ষা**—একটি শক্ত তামার তারের এক প্রান্তে এক টুকরা মোমবাতি বসাও। তারের অপর প্রান্তটিতে একখানি ফুটা পিচবোর্ডের চাকতি লাগাও। এখন মোমবাতিটি জ্বালিয়া একটি গ্যাস-জারের মধ্যে প্রবেশ করাও (৮নং চিত্র—ক) এবং পিচবোর্ডের চাকতিটি দিয়া ঐ গ্যাস-জারের মুখটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দাও (৮নং চিত্র—খ)। দেখ, মোমবাতির শিখা ক্রমশঃ ছোট হইয়া নিভিয়া গেল। লক্ষ্য কর, পাত্রের মধ্যে **জলবিন্দু দেখা যাইতেছে।** মোমবাতিটি উঠাইয়া লইয়া জারের মধ্যে একটু পরিষ্কার চুনের জল দিয়া নাড়। দেখ, উহা আর পরিষ্কার নাই, সাদা ঘোলাটে হইয়াছে। ইহা হইতে

বুঝা গেল মোমবাতি জ্বলিবার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে।

দহনের সময় দাহ্য বস্তুগুলি অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে; ইহাদিগকে সেই সকল বস্তুর অক্সাইড (oxide) বলে।

জ্বলন্ত পদার্থ বায়ু ব্যবহার করে (Burning substances use air)—

বায়ুতে অক্সিজেন ব্যতীত কোন পদার্থ জ্বলিতে পারে না। এইজন্য কোন জ্বলন্ত পদার্থকে চাপা দিয়া বায়ুর সংযোগ বন্ধ করিয়া দিলে উহা শীঘ্রই নিভিয়া যায়। জ্বলন্ত পদার্থ জ্বলিবার সময় বায়ুর অক্সিজেন ব্যবহার করে। উপরোক্ত পরীক্ষার (৮নং পরীক্ষা) পর তোমরা যদি একটি জ্বলন্ত মোমবাতি পুনরায় জারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা গেল মোমবাতির দহনের সময় জারের সমস্ত অক্সিজেন ব্যবহৃত হইয়াছে।

দহন ও শ্বাসকার্য (Combustion and respiration)—

জীবের শ্বাসকার্য দিবারাত্র চলিতেছে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্থলচর প্রাণী ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য করিয়া থাকে। মাছ ফুলকার সাহায্যে এবং কীট-পতঙ্গ বায়ু-নল দ্বারা শ্বাসকার্য করে। যে উপায়েই হউক জীবনধারণের জন্য জীবমাত্রেরই শ্বাসকার্য বিশেষ প্রয়োজন। তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি প্রশ্বাসের সময় আমরা বায়ু হইতে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি উহা রক্তস্রোতের সহিত মিশিয়া দেহের সকল স্থানে যায় এবং খাদ্যদ্রব্যের কার্বন ও হাই-ড্রোজেনের দহন ঘটায়। এখন তোমরা বলিতে পার যদি দেহের মধ্যে কোন প্রকার দহন-ক্রিয়া হয় তাহা হইলে সে আগুনের

আলোক ও তাপ কোথায় ? দেহের মধ্যে অক্সিজেনের সাহায্যে যে দহন-ক্রিয়া হয় উহা মোমবাতির দহনের মত এত তীব্র নহে, এইজন্য কোনও আলোক উৎপন্ন হয় না। ইহা অনেকটা লোহার মরিচা-ধরার মত ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। সুতরাং শ্বাসকার্যকে মৃদু দহন বলা যাইতে পারে। এই দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তাপ সৃষ্টি হয়। আমরা নিঃশ্বাসের সময় এই সকল পদার্থ ত্যাগ করি। বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব হইলে দহন-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া জীবদেহ শীতল হইয়া যায় এবং জীবের মৃত্যু ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প পরিত্যক্ত হয় তাহা সহজেই নিম্নলিখিত পরীক্ষা দুইটির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—



৯নং চিত্র

৯নং পরীক্ষা—একটি কাচের গেলাসে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল লও এবং একটি নলের সাহায্যে উহার মধ্যে ফুঁ দাও (৯নং চিত্র)। দেখ, চুনের জল সাদা ঘোলাটে হইয়া গেল। চুনের জল কেন ঘোলাটে হয় তাহা তোমাদিগকে পূর্বে বলা হইয়াছে। চুনের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশিয়া সাদা খড়িমাটি উৎপন্ন হওয়ার ফলেই জল ঘোলাটে হইয়াছে। সুতরাং নিঃশ্বাসের সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হয়, তাহা প্রমাণিত হইল।

১০নং পরীক্ষা—মুখের কাছে একখানি শ্লেট ধর এবং উহাতে ভাপ দাও। দেখ, শ্লেটের উপর জলবিন্দু জমা হইয়াছে। ইহার

কারণ জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা প্লেটের সংস্পর্শে আসিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে।

দহন ও মরিচা-ধরার তুলনা (Comparison between combustion and rusting)—

দহন ও মরিচা-ধরা অনেকটা একই ধরনের ব্যাপার। তবে উহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

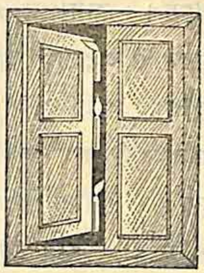
দহন	মরিচা-ধরা
(১) দহনের সময় দাহ্য বস্তুর সহিত অক্সিজেনের খুব দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া হয়।	(১) মরিচা-ধরার সময় লোহার সহিত অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের মৃদু রাসায়নিক ক্রিয়া হয়।
(২) দহনের ফলে আলোক ও তাপ উৎপন্ন হয়।	(২) মরিচা-ধরার সময় আলোক উৎপন্ন হয় না, তাপ এত কম সৃষ্টি হয় যে উহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না।
(৩) দহনের ফলে সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সৃষ্টি হয়।	(৩) মরিচা-ধরার ফলে লাল লোহার অক্সাইড উৎপন্ন হয়।
(৪) দহনকার্যে অনেক সময় অগ্নি-সংযোগ করিতে হয়।	(৪) মরিচা-ধরা কার্যে অগ্নি-সংযোগ প্রয়োজন হয় না।

৫। বায়ুচলন (Ventilation)

বায়ু কখনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। ইহা সর্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। সূর্যের তাপে মাটি, বালি, পাথর প্রভৃতি গরম হয়। সেই সঙ্গে উহাদের সহিত সংলগ্ন বায়ুও গরম হয়। বায়ু গরম হইলেই প্রসারিত হইয়া হালকা হয় ও উপরে উঠিয়া যায়। তখন চারিদিকের ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই ঠাণ্ডা বায়ু আবার কিছুক্ষণ পরে গরম হইয়া উপরে উঠে এবং নূতন ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে। এইভাবে বায়ুচলনের সৃষ্টি হয়।

বায়ুচলনের সাধারন নীতি (The main principles involved in ventilation)—

মানুষের নিঃশ্বাসে ঘরের বায়ু দূষিত ও উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু হালকা বলিয়া উপরে উঠে এবং জানালা ও দরজা দিয়া বাহিরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু ঘরে প্রবেশ করে। উপরে উঠিয়া উত্তপ্ত ও দূষিত বায়ু যদি বাহিরে যাইবার পথ পায়, তাহা হইলেই এই বায়ু-চলনের কাজ ভাল করিয়া চলে এবং ঘরের বায়ুও বিশুদ্ধ থাকে। বাহিরে যখন বায়ু বহিতেছে কিনা বুঝা যায় না, তখনও বাহিরের বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। ইহা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—



১০নং চিত্র

১১নং পরীক্ষা—জোরে বায়ু বহিতেছে না এমন এক রাত্রে বন্ধ ঘরের একটি দরজা আধ-খোলা রাখ। এখন একটি মোমবাতি লইয়া জ্বালাও। মোমবাতিটি যথাক্রমে দরজার উপর দিকে, নীচের দিকে এবং মাঝখানে ধর। দেখ, উপরে বাতির শিখাটি ঘরের বাহিরের দিকে এবং নীচে বাতির শিখাটি ঘরের ভিতরের দিকে বাঁকিয়াছে, কিন্তু মাঝখানে বাতিটির শিখা কোন দিকেই বাঁকে নাই (১০নং চিত্র)। ইহা হইতে জানা গেল, নীচের বায়ু প্রবাহিত হয় ভিতরের দিকে, উপরের বায়ু বাহিরের দিকে এবং মধ্যস্থলের বায়ু কোন দিকেই প্রবাহিত হয় না।

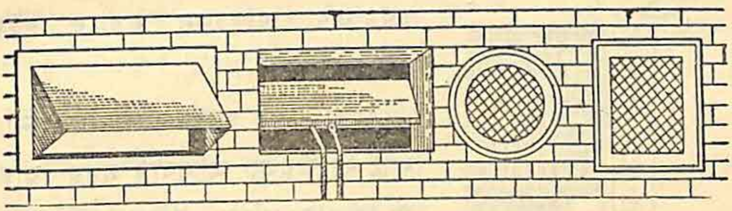
বায়ুচলনের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ (The role of ventilation in the health of man)—

বায়ুচলনের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রশ্বাসের সময় বায়ুর অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া

দূষিত রক্ত শোধন করে। সুতরাং পরিমিত বিশুদ্ধ বায়ুর সাহায্যে রক্ত শোধিত না হইলে কার্যশক্তি ও দেহের তাপ পাওয়া যায় না এবং খাদ্য পরিপাক হয় না। ইহার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেনপূর্ণ বায়ু পাইবার জন্য বায়ুচলন বিশেষ আবশ্যক। কোন স্থানে বহু লোকের সমাগম হইলে, উহাদের শ্বাসকার্যের ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমিয়া যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং তাপ সৃষ্টির ফলে বায়ু গরম ও দূষিত হইয়া পড়ে। ক্রমাগত এই দূষিত বায়ু সেবন করিয়া লোকগুলি ক্রমশঃ গরম ও অসুস্থ বোধ করে। বেশীক্ষণ ঐ স্থানে থাকিলে চোখ জ্বালা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, গা বমি-বমি করা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দেয়, অনেক সময় শ্বাস লইতেও কষ্ট বোধ হয়। শরীর দুর্বল থাকিলে মূর্ছা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। শীতকালে ছোট ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শুইলে যে লোক মরিয়া যায় তাহা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ইহার কারণ, দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় বায়ুচলন হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বায়ুতে যতটুকু অক্সিজেন ছিল তাহা শ্বাসকার্যের দ্বারা ব্যয়িত হইলে পর আর শ্বাসকার্য চলে না। বদ্ধ ঘরের বায়ুতে নানাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকে। ইহারা প্রশ্বাসের সহিত ফুসফুসে যাইয়া নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে। উনানে কাঠ বা কয়লা জ্বলিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধূম, গন্ধক-সংযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং রান্নাঘরের বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। এই দূষিত বায়ু বাহির হইতে না পারিলে শ্বাসকার্যের ব্যাঘাত হয় এবং ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে।

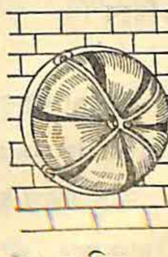
বাসঘরে ও রান্নাঘরে বায়ুচলনের ব্যবস্থা (Methods of ventilating a room and a kitchen)—

যে-সকল ঘরে আমরা বাস করি এবং স্কুল-কলেজের যে-সকল ঘরে বহু ছাত্র-ছাত্রীর একত্র সমাবেশ হয়, সেই সকল ঘরে বায়ুচলনের



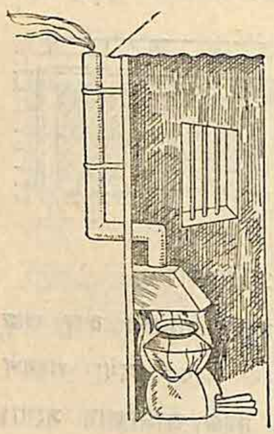
১১নং চিত্র – বিভিন্ন প্রকারের ভেণ্টিলেটার

উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘরের দরজা-জানালা রুজু রুজু করিয়া বসাইতে হইবে, যাহাতে বায়ু সহজে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে ও বাহির হইয়া যাইতে পারে। দরজা-জানালার সংখ্যা যত বেশী হয় ও আকারে যত বড় হয় ততই ভাল। বাসঘরে বেশী আসবাবপত্র রাখিবে না, ইহাতে বায়ুচলনের ব্যাঘাত ঘটে। বাসঘরের দূষিত গরম বায়ু যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে সেজন্য ছাদের নীচে দেওয়ালে জাল-লাগান বা কাচের ঘুলঘুলি রাখিতে হয়; ইহাদিগকে **ভেণ্টিলেটার** (ventilator) বলে। বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য দেওয়ালের নীচের দিকে ছোট ছোট ফোকর থাকিবে। টানা পাখা ও বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে বাসঘরের বায়ুচলনের ব্যবস্থা হইতে পারে। দেওয়ালে বড় গোলাকার বৈদ্যুতিক আকর্ষক পাখার (exhaust fan) সাহায্যে ঘরের দূষিত গরম বায়ু



১২নং চিত্র—
আকর্ষক পাখা

বাহির করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আজকাল থিয়েটার ও সিনেমা হলে বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (air-condition) বলে। এই ব্যবস্থায় ঘরের আর্দ্রতা ও উষ্ণতা দেহের উপযোগী হয় এবং বায়ুচলন অবাধে হইয়া থাকে।



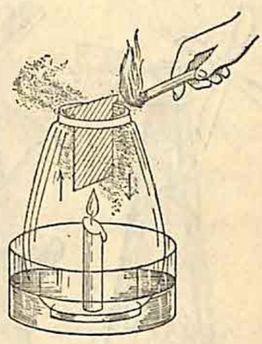
১৩নং চিত্র—রান্নাঘরে চিমনির ব্যবস্থা

তোমাদের পূর্বে বলিয়াছি উনানে কাঠ বা কয়লা জ্বলিবার সময় রান্না-ঘরের বায়ু দূষিত হইয়া যায়। এই দূষিত বায়ু সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইহা সহজে যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা দরকার। এইজন্য উনানের উপর হইতে চিমনি (chimney) বা নল রাখিতে হইবে (১৩নং চিত্র)। রান্নাঘরটি বেশ প্রশস্ত হওয়া দরকার এবং উহাতে বড় বড় জানালা থাকিবে। ইহাতে সকল সময়ে বিশুদ্ধ বায়ু রান্নাঘরে প্রবেশ করিবে।

উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠে এবং শীতল বায়ু নীচে নামে (Hot air rises and cold air sinks)—

বায়ু উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত ও হালকা হয় এবং উপর দিকে উঠিয়া যায়। শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী বলিয়া নীচের দিকে নামিয়া ঐ উত্তপ্ত বায়ুর স্থান অধিকার করে। তোমরা সহজেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—

১২নং পরীক্ষা—একটি মোমবাতি একটি কাচ পাত্রের উপর দাঁড় করাইয়া রাখ এবং ঐ পাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া উহা আংশিকভাবে পূর্ণ কর। এখন ঐ পাত্রে একটি চিমনি এমনভাবে রাখ যাহাতে মোমবাতিটি উহার ঠিক মাঝখানে থাকে। এইবার চিমনির মাথায় একটি T-আকারের টিনের পাত বা কার্ডবোর্ড রাখ, যাহাতে চিমনির মুখের ফাঁদল দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায় (১৪নং চিত্র)। মোমবাতিটি জ্বালিয়া দাও। দেখ, বাতিটি নিভিবে না, কারণ চিমনির ফাঁদলের এক ভাগ দিয়া অক্সিজেনপূর্ণ ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশ করিবে এবং অপর ভাগ দিয়া ঐ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। এই সময় চিমনির মুখের কাছে ধূমায়মান কাগজের পলিতা বা অন্য কিছু ধরিলে দেখা যাইবে ধোঁয়া ফাঁদলের এক দিক দিয়া চিমনির ভিতরে প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দিক দিয়া উহা বাহিরে আসিতেছে।

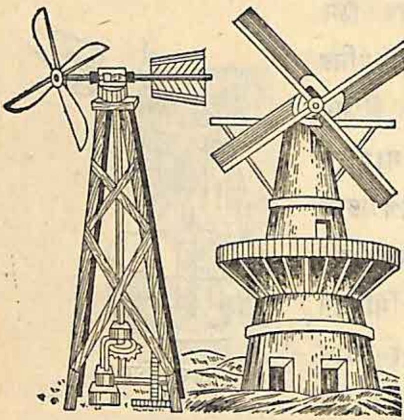


১৪নং চিত্র

বায়ু-চালিত যন্ত্র হইতে শক্তি উৎপাদন (Wind-mill as generator of energy)—

মুক্ত প্রান্তরে প্রবহমান বায়ু যে বেশ জোরে বহে তাহা তোমরা জান। মাটি হইতে ২৫।৩০ ফুট উচুতে বায়ুর বেগ আরও বেশী। এই গতিশীল বায়ুকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা দ্বাদশ শতাব্দীরও পূর্ব হইতে জার্মানী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ছিল। এই যন্ত্রকে বায়ু-চালিত যন্ত্র বা বায়ু-কল (wind-mill) বলে।

এই যন্ত্রের (১৫নং চিত্র) কল-কৌশল অতি সহজ ধরনের। বৈদ্যুতিক পাখায় যেমন কয়েকটি কাঠের বা ধাতুর বাঁকা ফলক (blade) থাকে, তেমনি কয়েকটি ফলক দিয়া একটি চাকা তৈয়ারী করা হয়। চাকাটি খাড়া-ভাবে থাকে এবং ইহার গোলাকার অক্ষদণ্ডটি একটি উচু থামের উপর ফ্রেমের সাহায্যে বসান থাকে। ফলকে বায়ু লাগিলেই চাকাটি এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষদণ্ডটি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান অক্ষদণ্ডের সহিত একটি বড় দন্তচক্র (toothed wheel) ও মোটা দড়ি বা ফিতা (belting) লাগাইয়া মাটির উপর নানা প্রকার কল চালান হয়। এই প্রকার বায়ু-চালিত কলের সাহায্যে হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে গম পেষা, কূপ হইতে জল তোলা, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা, বীজ হইতে তৈল বাহির করা, প্রভৃতি নানাপ্রকার কাজ হয়।



১৫নং চিত্র—বায়ু-কল

প্রশ্ন

১। বায়ু কি দিয়া গঠিত? বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। দহন ও শ্বাসকার্যের তুলনা কর। মরিচা-ধরা কি? মরিচা-ধরা একপ্রকার মৃদু দহন কেন? মরিচা ধরিবার জন্য যে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। বায়ুচলনের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ? বাসঘরে ও রান্নাঘরে বায়ুচলনের কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায় তাহা বর্ণনা কর।

৪। বায়ু-কল কাহাকে বলে? ইহা কিরূপে কার্য করে?

S.C.E.R.T. West Bengal
Date.......................
Acc. No. 5676 5776
SIE/194
S.C.E.R.T. West Bengal Library 25/3, B. C. Road, Calcutta
State Institute of Education

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল (Water)

জলের উৎস (Sources of water)—

সমুদ্রই জলের প্রধান উৎস। ইহা ব্যতীত নদী, হ্রদ, বৃষ্টি, ঝরণা প্রভৃতি জলের অন্যান্য উৎস। এইগুলিকে **প্রাকৃতিক উৎস** বলে। আবার খাল, পুকুর ও কূপকে **কৃত্রিম উৎস** বলে, কারণ ইহারা মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট।

বৃষ্টির জল—জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যখন বৃষ্টিতে পরিণত হয় তখন অবশ্য উহা খুব বিশুদ্ধ ; কিন্তু জল অনেক বস্তু দ্রবীভূত করিতে পারে বলিয়া বৃষ্টির জল বায়ুর মধ্য দিয়া পড়িবার সময় ইহাতে বায়ুস্থিত কয়েকটি গ্যাস যেমন অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দ্রবীভূত হয়। ইহা ব্যতীত বৃষ্টির জলের সহিত বায়ুমণ্ডলের ভাসমান ধূলিকণাও মিশিয়া থাকে। তথাপি অন্যান্য প্রাকৃতিক জলের তুলনায় বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ঝরণার জল—বৃষ্টির জলের কিছু অংশ ভূ-পৃষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে। এই জল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে কঠিন অপ্রবেশ্য শিলাস্তরে পৌঁছায়। এই স্তরে বাধা পাইয়া জল উহার ঢাল বহিয়া যাইতে থাকে এবং পরে খাড়া ফাটল দিয়া বাহির হইয়া আসে। এইরূপে **ঝরণার** সৃষ্টি হয়। জল ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া উহাতে কোন ভাসমান পদার্থ থাকে না, তবে নানাবিধ ধাতব পদার্থ ইহাতে দ্রবীভূত থাকে। দ্রবীভূত পদার্থের গুণ অনুসারে ঝরণার জল উহাদের গুণ পাইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরের ঝরণার জল বিখ্যাত। ইহাতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লোহা-ঘটিত অনেক উপকারী লবণ (salt) দ্রবীভূত থাকে। কোন কোন ঝরণার জলে গন্ধক-ঘটিত লবণ থাকে বলিয়া উহা পানের পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও চর্মরোগীর স্নানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নদীর জল—বৃষ্টির জল পাহাড় অথবা ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ স্থান হইতে নীচের দিকে গড়াইয়া নদ-নদী সৃষ্টি করে। পাথর বা মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় অনেক পদার্থ-ই উহাতে দ্রবীভূত হয়। ইহা ব্যতীত নদীর জলে নানাবিধ ভাসমান পদার্থ থাকে, কারণ বৃষ্টির সময় উহার উভয় তীরের আবর্জনা ধৌত হইয়া জলের সহিত মিশে। ইহারা সূক্ষ্ম কণারূপে ভাসিয়া থাকে বলিয়া নদীর জল এত ঘোলা দেখায়।

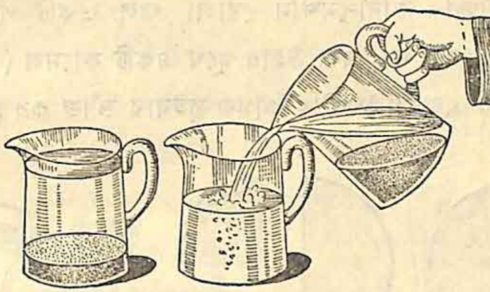
সমুদ্রের জল—সমুদ্রের জলে নানাবিধ লবণ, বিশেষতঃ সাধারণ লবণ (sodium chloride) অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। এই জল অত্যন্ত লবণাক্ত বলিয়া পানের অযোগ্য।

কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত জল—বৃষ্টির জল ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরের সচ্ছিদ্র বালুকাময় স্তরে সঞ্চিত হয়। সুতরাং যে-সকল স্থানে প্রাকৃতিক জল পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে পুকুর বা কূপ খনন করিয়া অথবা নলকূপ বসাইয়া ঐ সঞ্চিত জল সংগ্রহ করা হয়।

জল পরিশুদ্ধিকরণ (Purification of water)—

জল পরিশুদ্ধি করিবার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে। কোথায় কোন্‌টি উপযুক্ত তাহা প্রক্রিয়াগুলি জানিলেই বুঝিতে পারিবে।

(১) **আস্রাবণ** (Decantation)—বালিমিশ্রিত চিনির দ্রবণ হইতে বালি সহজেই পৃথক্ করা যায়। চিনি জলে দ্রাব্য বলিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং অদ্রাব্য বালির কণা ভারি বলিয়া তলায় থিতাইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পাত্রটি সাবধানে কাত করিয়া



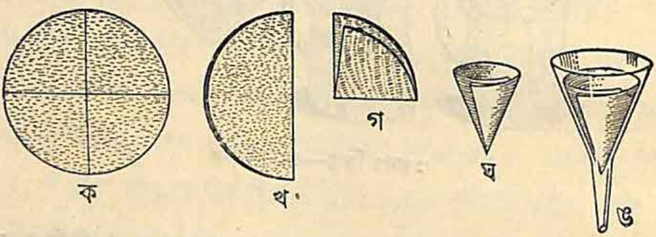
১৬নং চিত্র—আস্রাবণ

উহার জল ধীরে ধীরে ঢালিয়া লইলে (১৬নং চিত্র) চিনির দ্রবণ ও বালি পৃথক্ হইয়া পড়িবে। এই নিয়মে পৃথক্ করাকে **আস্রাবণ** বলে।

(২) **পরিস্রাবণ বা ছাঁকন** (Filtration)—বালির সঙ্গে যদি কাদা কিংবা সূক্ষ্ম খড়িমাটির গুঁড়া থাকিত, তাহা হইলে উহারা থিতাইয়া পড়িত না, ভাসিয়া থাকিত। তখন ইহাদিগকে কি করিয়া পৃথক্ করা যায়? পৃথক্ করা যায় ছাঁকিয়া। এই প্রক্রিয়াকে পরিস্রাবণ বলে। সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে মোটামুটিভাবে জল ছাঁকা হয় এক টুকরা পাতলা পরিষ্কার কাপড় দিয়া। ইহাতে কিন্তু অদ্রাব্য বস্তুর সূক্ষ্ম কণাগুলি ভাল করিয়া কাপড়ে না আটকাইয়া তরল পদার্থের সঙ্গে চলিয়া যায়। এইজন্য বিজ্ঞানাগারে কাপড়ের পরিবর্তে এক রকম পাতলা চোষ

কাগজ ব্যবহার করা হয় ; উহাকে ফিল্টার কাগজ (filter paper) বলে। ইহা আকৃতিতে গোলাকার। তোমরা কালি চুষিবার জন্য যে ব্লটিং কাগজ ব্যবহার কর তাহাতেও চলে, তবে ইহা পাতলা হইলে ভাল হয়। ফিল্টার করিবার প্রণালী পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইব।

১৩নং পরীক্ষা—কাদা-মেশান ঘোলা জল একটি পাত্রে রাখ। আর একটি কাচপাত্র লও এবং উহার মুখে একটি ফানেল (funnel) রাখ। তারপর একখণ্ড ফিল্টার কাগজ দুইবার ভাঁজ কর। এইবার

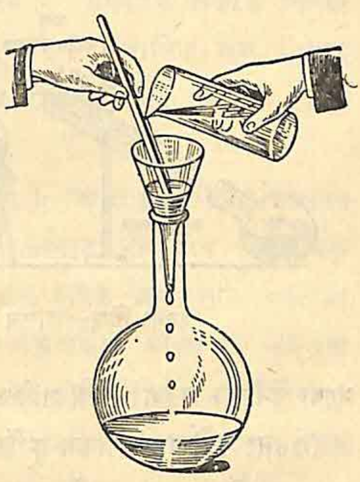


১৭নং চিত্র—ফিল্টার কাগজ ভাঁজ করিবার প্রণালী

চারি ভাঁজবিশিষ্ট যে কাগজ হইল তাহার একটি ভাঁজ খুলিয়া ফানেলের উপর রাখিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া দাও (১৭নং চিত্র)। ফিল্টার কাগজখানি ফানেলে আটকাইয়া থাকিবে। এইবার ফানেলের মধ্যে ঘোলা জল একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দাও। দেখ, পরিষ্কৃত জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফানেলের নল দিয়া নীচের পাত্রে পড়িবে ও অদ্রাব্য বস্তুগুলি ফিল্টার কাগজের উপর থাকিয়া যাইবে (১৮নং চিত্র)। অদ্রাব্য বস্তুগুলির এইরূপভাবে পৃথক্ হওয়ার কারণ এই যে, ফিল্টার কাগজের মধ্যে যে ছিদ্র আছে তাহা খুব সূক্ষ্ম, চোখে দেখা যায় না। জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে কিন্তু কঠিন পদার্থের কণাগুলি অত

সূক্ষ্ম নয় বলিয়া আটকাইয়া যায়। তরল পদার্থটিকে খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে দুই-তিন বার ফিল্টার করিতে হয়।

বালি ও কয়লার মধ্য দিয়া ঘোলা জল প্রবাহিত হইলেও জলের ময়লা বালি ও কয়লার মধ্যে আটকাইয়া যায়। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে নদী ও পুকুরের ঘোলা জল এইরূপে কলস ফিল্টারের সাহায্যে সহজে ও কম খরচায় পরিস্রুত করা হয়—তাহা বোধ হয় তোমরা জান। শহরের কলের জলের পরিস্রুতির জন্যও বালির মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা থাকে।

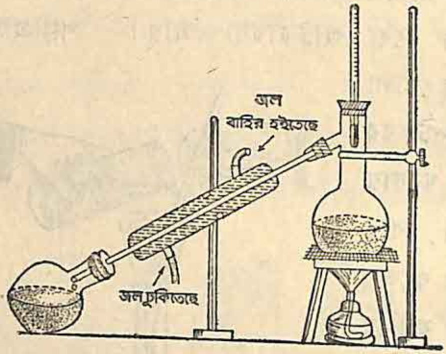


১৮নং চিত্র—পরিস্রাবণ

(৩) পাতন (Distillation)—ফিল্টার করা ব্যতীত কাদা-মিশ্রিত জল হইতে কিংবা কোন দ্রবণ হইতে জল বা অন্য তরল পদার্থ পৃথক্ করিবার আর একটি উপায় আছে। ইহাকে **পাতন** বলে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তাপের সাহায্যে তরল পদার্থকে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করিয়া ও পরে শৈত্য প্রয়োগে উহাকে ঘনীভূত করিয়া পুনরায় তরল অবস্থায় আনা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে পাতন করা হয় তাহাকে পাতন-যন্ত্র বলে।

পাতন-যন্ত্রের তিনটি অংশ আছে: (ক) **পাতন-কূপী** (distilling flask)—ইহাতে তাপ প্রয়োগ করিয়া তরল পদার্থটিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। (খ) **শীতক** (condenser)—ইহার সাহায্যে বাষ্পকে ঘনীভূত করা হয়; লক্ষ্য করিবে, ইহাতে

একটি সরু নল আছে এবং উহার চারিধারে একটি মোটা নল আছে। মোটা নলের নীচের ছোট নল দিয়া জল প্রবেশ করে এবং উপরের ছোট নল দিয়া জল বাহির হইয়া যায়। এইরূপে সরু নলের চারিদিকে ঠাণ্ডা জলের স্রোত বহাইবার ব্যবস্থা আছে। (গ) গ্রাহক (receiver)—ইহা একটি পাত্র বিশেষ; ইহার মধ্যে ঘনীভূত তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়।



১৯নং চিত্র—পাতন

১৪নং পরীক্ষা—পাতন-কূপীতে খানিকটা লবণাক্ত ঘোলা জল লও এবং উহার মুখ একটি রবারের ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ছিপির ফুটার মধ্য দিয়া একটি থার্মোমিটার প্রবেশ করাও কিন্তু ইহা যেন দ্রবণের উপরে থাকে। পাতন-কূপীর নির্গম-নলটি (delivery tube) কর্কের সাহায্যে শীতকের সহিত যুক্ত কর। শীতকটি একটু কাত করিয়া রাখিয়া উহার সরু নলটি কর্কের সাহায্যে গ্রাহকের সহিত যুক্ত কর (১৯নং চিত্র)। এখন পাতন-কূপীকে উত্তাপ দিলে বাষ্প উৎপন্ন হইবে। ইহা শীতকের সরু নলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শীতল জলস্রোতের সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং নলটি কাত হইয়া আছে বলিয়া উহা গ্রাহকে গড়াইয়া পড়ে। দ্রবীভূত লবণ ও অদ্রাব্য কাদা পাতন-কূপীর মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। লক্ষ্য করিবে, পাতন ক্রিয়া

যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণ থার্মোমিটারের পারদ ১০০° সেন্টিগ্রেড দাগে স্থির থাকিবে।

এই প্রকার জলকে পাতিত জল (distilled water) বলে। পাতিত জল বর্ণহীন ও স্বচ্ছ, ইহাতে লবণের কোন স্বাদ নাই। বিজ্ঞানীরা ইহাকে বিশুদ্ধ জল বলেন। ঔষধাদি প্রস্তুতে কিংবা রাসায়নিক কাজে এই জল ব্যবহৃত হয়। পাতিত জল বিশুদ্ধ হইলেও ইহা পানীয়রূপে ব্যবহারের যোগ্য নহে, কারণ ইহার কোনরূপ স্বাদ নাই।

(৪) **নির্বীজন** (Sterilization)—আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় জল পরিষ্কার দেখাইলেও উহাতে নানাবিধ সংক্রামক রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। এইরূপ দূষিত জল পান করিলে কঠিন রোগে আক্রান্ত, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এইজন্য জল পরিশুদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়া দ্বারা জল জীবাণু-শূন্য করা হয় তাহাকে **নির্বীজন** বলে। নির্বীজন নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হয়, যথা—

(ক) জলকে জীবাণু-শূন্য করিতে হইলে ইহাকে প্রায় ২০৷২৫ মিনিট ফুটাইতে হয়। জীবাণুগুলি অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। মনে রাখিও, ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায়। (খ) গার্হস্থ্য ফিল্টার (Pasteur chamberland) অথবা বার্কফেল্ড (Berkefeld) ফিল্টারের সাহায্যে জল জীবাণুমুক্ত হয়। (গ) রাসায়নিক দ্রব্য—যথা, ক্লোরিণ (chlorine), ব্লিচিং পাউডার (bleaching powder), পটাশ পারম্যাংগানেট (potassium permanganate) প্রভৃতি দ্বারাও জল জীবাণু-শূন্য করা যায়, তবে ইহাতে জলে একটা বিশ্রী গন্ধ হয় ও জল বিস্বাদ বোধ হয়। (ঘ) অতি-বেগুনি রশ্মির (ultra violet rays)

সাহায্যে জল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জীবাণু-শূন্য হইয়া থাকে। এই রশ্মি সূর্যকিরণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সুতরাং জলকে সূর্যকিরণে কিছুক্ষণ রাখিলে উহা জীবাণুমুক্ত হয়।

জীবনধারণে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা (Importance of purified water to living objects)—

তোমরা জান কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগের জীবাণু জলের দ্বারা আমাদের দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। নানা কারণে পল্লীগ্রামে জলাশয়ের জল দূষিত হয় এবং এই দূষিত জল পান করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও বহু লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশুদ্ধ জল সহজে পাইতে হইলে উহা বিশ-পঁচিশ মিনিট ফুটাইয়া জীবাণু-শূন্য করিতে হয়। এই জল পান করিলে কোন সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা থাকে না। এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে জীবের পক্ষে বিশুদ্ধ জল কত প্রয়োজনীয়।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ
(Mechanical mixture and Chemical compound)

আমরা যে-সকল পদার্থ চারিদিকে দেখিতে পাই, রসায়ন-শাস্ত্র মতে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) মৌলিক (element) অর্থাৎ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া একটির বেশী পৃথক্ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া সম্ভব নয়; যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস এবং সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি ধাতু। (২) যৌগিক (compound) অর্থাৎ যে পদার্থ দুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত এবং বিশ্লেষণ করিলে এই

বিভিন্ন পদার্থ পৃথক্‌ভাবে পাওয়া যায়; যেমন—জল, মরিচা প্রভৃতি। আজ পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মিশ্র পদার্থ (Mixture)—কোন পদার্থের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে, এবং সেই উপাদানগুলির নিজস্ব ধর্ম সেই পদার্থের মধ্যে বর্তমান থাকিলে, তাহাকে **মিশ্র পদার্থ** বলে। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলির অনুপাতের কোনও স্থিরতা নাই। এই উপাদানগুলিকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় তাপের কোনও তারতম্য হয় না।

যৌগিক পদার্থ (Chemical compound)—দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত পদার্থকে **যৌগিক পদার্থ** বলে। ইহা যে সকল উপাদানে গঠিত তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম লুপ্ত হইয়া গিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়। যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলি সর্বদাই নির্দিষ্ট অনুপাতে বর্তমান থাকে এবং ইহাদিগকে সহজে পৃথক্ করা যায় না। যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় কিছু তাপের উদ্ভব বা হরণ হইয়া থাকে।

নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা তোমরা মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারিবে ঃ—

১৫নং পরীক্ষা—একটি পাত্রে খানিকটা লোহার গুঁড়া ও গন্ধকের গুঁড়া যে কোনও অনুপাতে ভাল করিয়া মিশাও। যে পদার্থ তৈয়ারী হইল, ইহা মিশ্র পদার্থ। একখানি আতস-কাচ (magnifying glass) দিয়া দেখ, লোহার ও গন্ধকের কণাগুলি পাশাপাশি অবস্থিত আছে। একখানি চুম্বক নিকটে আনিলে, উহা ঐ মিশ্রণ হইতে লোহার কণাগুলিকে আর্কষণ করিয়া লইবে (২০নং চিত্র)। এইভাবে চুম্বকের সাহায্যে লোহার কণাগুলি গন্ধকের গুঁড়া হইতে পৃথক্ করা যায়। চুম্বকের সাহায্যে পৃথক্

না করিয়া এই মিশ্র পদার্থ কার্বন ডাই-সালফাইড (carbon di sulphide) নামক একটি তরল পদার্থে ফেলিয়া দিয়া একটু নাড়িয়া দাও ; তাহা হইলে গন্ধকের গুঁড়া উহাতে গলিয়া যাইবে এবং লোহার কণাগুলি তলায় থিতাইয়া পড়িবে। গন্ধক-দ্রবণ ফিল্টার করিয়া কোন গরম পাত্রে রাখিয়া দিলে, তরল অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে এবং সমস্ত গন্ধক ফিরিয়া পাইবে। অথবা ঐ মিশ্র পদার্থে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে লোহার কণাগুলি গলিয়া যাইবে এবং গন্ধকের গুঁড়া ফিল্টার করিয়া পৃথক্ করিতে পারিবে।



২০নং চিত্র—চুম্বকের সাহায্যে লোহার কণার পৃথকীকরণ

এইবার লোহা ও গন্ধক গুঁড়ার মিশ্রণের কিছু অংশ একটি পরীক্ষা-নলে (test tube) লইয়া ধীরে ধীরে তাপ দিলে দেখিবে, উহা ভয়ানক গরম হইয়াছে এবং গলিয়া লাল হইয়া জ্বলিতেছে। গলিত পদার্থ ঠাণ্ডা হইলে দেখিবে যে, মিশ্রটি একটি কাল ডেলায় পরিণত হইয়াছে। ডেলাটি গুঁড়া করিয়া আতস-কাচ দিয়া দেখিলে হলদে রঙের গন্ধকের গুঁড়ার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইবে না। চুম্বক দ্বারাও উহাদের কোন অংশ আকৃষ্ট হইবে না, অথবা কার্বন ডাই-সালফাইডেও কোন অংশ গলিবে না। সুতরাং একটি নূতন পদার্থের যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা লোহা ও গন্ধকের একটি যৌগিক পদার্থ—নাম ফেরাস সালফাইড

(ferrous sulphide)। উহা যে নির্দিষ্ট অনুপাতের লোহা ও গন্ধকের সংমিশ্রণে তৈয়ারী হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে ; কেন-না, ঐ নির্দিষ্ট অনুপাতে অতিরিক্ত গন্ধক বা লোহা যে পরিমাণে বেশী ছিল, তাহা অবশিষ্ট আছে এবং সহজে পৃথক্ করা যায়।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

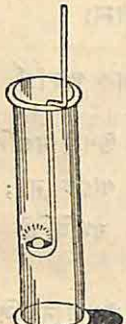
মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
(১) ইহাতে উপাদানগুলির নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান থাকে।	(১) ইহাতে উপাদানগুলির নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান থাকে না ; একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়।
(২) ইহাতে উপাদানগুলি যে কোনও পরিমাণে থাকিতে পারে।	(২) ইহাতে উপাদানগুলির ভাগ একেবারে নির্দিষ্ট।
(৩) ইহার উপাদানগুলি সহজে পৃথক্ করা যায়।	(৩) ইহার উপাদানগুলি সহজে পৃথক্ করা যায় না।
(৪) ইহা প্রস্তুত করিবার সময় তাপের কোন তারতম্য হয় না।	(৪) ইহা প্রস্তুত করিবার সময় কিছু তাপের উদ্ভব বা হরণ হয়।

বায়ু ও জলের উপাদানের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম (Some important properties of the elements of air and water)—

বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ—ইহাতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি কয়েকটি গ্যাস আছে। ইহাদের পরিমাণের কম-বেশী হইয়া থাকে। **জল একটি তরল যৌগিক পদার্থ।** ইহার

উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। ইহারা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। জলের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং আয়তন হিসাবে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন পাওয়া যায়। উপাদানগুলির নিজস্ব ধর্ম আছে। নিম্নে ইহাদের ধর্ম বর্ণনা করা হইল—

(ক) অক্সিজেনের ধর্ম—(১) অক্সিজেন একটি স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা শ্বাসকার্য-সহায়ক ; ইহা ব্যতীত কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। (৩) ইহা জলে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয় ; ইহার ফলেই জলচর প্রাণীরা শ্বাসকার্য করিতে পারে। (৪) ইহা নিজে জ্বলে না, কিন্তু ইহার সাহায্য ব্যতীত কোনও পদার্থ জ্বলিতে পারে না। (৫) ইহা খুব সক্রিয় গ্যাস, সহজেই বহু পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া অক্সাইড (oxide) নামক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। (৬) ইহা ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্বারা বিশোষিত হয়।



২১নং চিত্র—অক্সিজেনের মধ্যে পদার্থের দহন

(খ) নাইট্রোজেনের ধর্ম—(১) নাইট্রোজেন স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা জলে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। (৩) ইহা নিজে জ্বলে না এবং দহন কার্যেও কোন সহায়তা করে না। (৪) ইহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস, সহজে কোন পদার্থের সহিত যুক্ত হয় না।

(গ) কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম—(১) কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন গ্যাস, কিন্তু সামান্য মৃদু গন্ধ ও অম্ল স্বাদ আছে। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা দেড় গুণ ভারী। (৩) ইহা জলে দ্রবীভূত হয় এবং

নির্ভর করে। আবার উষ্ণতা অনুসারে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে গরম বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে এবং শীতকালে ঠাণ্ডা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম হয়। বর্ষাকালে বায়ু বেশ আর্দ্র, কারণ তখন ইহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। বায়ুর আর্দ্রতা আজ ৮২ হইলে বুঝিতে হইবে, যে পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকিলে বায়ু সংপৃক্ত হইত তাহার শতকরা ৮২ ভাগ জলীয় বাষ্প সেদিন বায়ুতে আছে।

শিশির (Dew)—শরৎকালে ভোরে উঠিয়া তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ যে, গাছের পাতায় ও ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু প্রভাত-সূর্যকিরণে মুক্তার মত ঝক ঝক করিতেছে। ইহা আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টির ফোঁটা নয়, চারিপার্শ্বের বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প ছিল তাহাই ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হইয়া শিশিরের আকার পাইয়াছে। শরৎকালেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। কেন-না শরৎকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে বলিয়া দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রকিরণে জলাশয় হইতে অধিক পরিমাণে বাষ্প বায়ুতে মিশে। রাত্রিতে সব জিনিষই যখন তাপ বিকিরণ করিয়া ঠাণ্ডা হয় তখন বায়ুতে যে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকে তাহা ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘনীভূত হয়। ঘাস ও পাতার উপরেই যে শিশির অধিক পরিমাণে জমে তাহার কারণ হইতেছে, মাটির তুলনায় ঘাস ও পাতা অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা হয় এবং উহারা মাটি হইতে শোষিত জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয় বলিয়া উহাদের চারিপার্শ্বের বায়ুতে স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। সুতরাং বায়ু ঠাণ্ডা হইলে উহা এতটা বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না, কাজেই অতিরিক্ত বাষ্প গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায় ঘনীভূত হইয়া সূক্ষ্ম জলকণায়

পরিণত হয়। কণাগুলি পরে একত্রিত হইয়া শিশিরবিন্দু রূপে দেখা দেয়।

তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, আকাশে মেঘ থাকিলে রাত্রে শিশির পড়ে না। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর বিকিরিত তাপ আকাশের মেঘ অনেকটা ফিরাইয়া দেয়। এই প্রতিফলিত তাপ পৃথিবীর উপর পড়ায় ঘাস, পাতা প্রভৃতি মেঘমুক্ত আকাশে যতটা ঠাণ্ডা হইত ততটা ঠাণ্ডা হয় না। কাজেই উহাদের সংস্পর্শে বায়ুও তত ঠাণ্ডা হয় না বলিয়া অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখে এবং শিশির পড়ে না।

বাতাসের যে তাপে শিশিরবিন্দু দেখা দেয় তাহাকে শিশির সৃষ্টির তাপ বা শিশিরাংক (dew point) বলে।

কুয়াশা (Fog)—হেমন্ত ও শীতের প্রাতে কুয়াশা হয়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সাধারণতঃ পুকুর, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ের ধারেই কুয়াশা গভীর হয়। রাত্রিতে সমস্ত বস্তু তাপ বিকিরণ করে, কিন্তু মাটি যতটা তাপ বিকিরণ করে জল ততটা করে না। ইহার ফলে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মাটি যতটা ঠাণ্ডা হয় জল ততটা ঠাণ্ডা হয় না। কাজেই জলাশয়ের উপরিস্থ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। এই বায়ু যখন ঠাণ্ডা মাটির কিংবা উহার উপরিস্থ ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে শিশিরাংকের নীচে নামিয়া আসে তখন ইহার অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প জমিয়া বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়া কুয়াশার সৃষ্টি করে। ভোরের দিকে কুয়াশা এমন গভীর হয় যে দু'হাত দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখা যায় না। আবার সূর্য উঠিলেই বায়ু গরম হয় ও অধিক বাষ্প ধারণ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া কুয়াশাও লোপ পায়।

মেঘ (Cloud)—জলীয় বাষ্প উপরের আকাশে ঘনীভূত হইলে উহাকে মেঘ বলে। উপরের আকাশে কি করিয়া বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয় তাহা এই :—সাগর, উপসাগর প্রভৃতি জলাশয় হইতে নিয়ত জলীয় বাষ্প উঠিয়া বায়ুতে মিশিতেছে। জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা, সুতরাং বায়ুতে যত অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, উহা ততই হালকা হইয়া সহজে উপরে উঠে। উপরের বায়ুস্তরে বায়ুর চাপ কম বলিয়া জলীয় বাষ্প ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া পড়ে। গ্যাসীয় পদার্থের প্রকৃতিই এই যে, উহারা প্রসারিত হইলে ঠাণ্ডা হয়। ইহা ব্যতীত উপরকার বায়ু খুব ঠাণ্ডা। কেন-না বায়ু সূর্যের তাপে গরম হয় না, গরম হয় পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া পরিচলনের ফলে। পরিচলনের স্রোত খুব উপরে যায় না বলিয়া উপরিস্থ বায়ু স্বভাবতঃই ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জলীয় বাষ্প এমন ঠাণ্ডা হয় যে তখন বায়ু আর সমস্ত বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। উহারা এত ক্ষুদ্র যে আকাশে ভাসিতে থাকে। এই ভাসমান জলকণাগুলিকেই মেঘ বলে।

বৃষ্টি (Rain)—আকাশে বেশী মেঘ জমিলে বায়ুর চাপে উহার ভাসমান জলকণা একত্রিত হইয়া যখন বড় হয়, তখন আর উহারা ভাসিতে পারে না, ওজনে ভারী হয় এবং পৃথিবীর আকর্ষণে বৃষ্টিধারায় পৃথিবীতে পড়ে। কখন কখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্বে খুব ঠাণ্ডা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে জমিয়া বরফ হয়। ইহাকে শিলাবৃষ্টি (hail storm) বলে।

প্রকৃতিতে জলচক্র (Water Cycle in Nature)—

সূর্যের তাপে সাগর, মহাসাগর, নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে অনবরত জল বাষ্পীভূত হইতেছে। জলীয় বাষ্প হালকা বলিয়া উহা সহজে উপরে উঠিতেছে এবং বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এই প্রকারে যদি বাষ্পীভবন হইতে থাকে, তবে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইবে। কোথাও একবিন্দুও জল থাকিবে না। কিন্তু প্রকৃতিতে তাহা হয় না। বায়ুর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ হয় এবং উহা পরে আরও ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টির জল নদী, ঝরণা প্রভৃতি পুষ্ট করিতেছে এবং হ্রদ, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইতেছে। নদীর জল আবার সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে। বৃষ্টির জলের কতক অংশ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়া অথবা উহার নীচ দিয়া প্রবাহিত হইয়া নদীতে ও সমুদ্রে পড়িতেছে। পর্বত শিখরের তুষার গলিয়া জলে পরিণত হইতেছে এবং উহা নদীতে যাইয়া পড়িতেছে। আবার নদী, সাগর প্রভৃতি জলাশয় হইতে জলীয় বাষ্প উপরে উঠিয়া কালক্রমে বৃষ্টিতে পরিণত হইতেছে। প্রকৃতিতে এইপ্রকার জলের একটা আবর্তন নিয়ত চলিতেছে। ইহাকেই **জলচক্র** বলে।

তুষার (Snow)—শীতপ্রধানদেশের বায়ু স্বভাবতঃই ঠাণ্ডা, এবং উপরের বায়ু আরও বেশী ঠাণ্ডা; সুতরাং মেঘে ভাসমান জলকণা একত্রিত হইয়া বড় হইবার পূর্বেই উহা জমিয়া বরফ হয় এবং পৃথিবীর আকর্ষণে বৃষ্টিধারায় পতিত না হইয়া তুষারপাত হয়। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশগুলি ঠাণ্ডা বলিয়া সমুদ্র-সমতলের মাটির উপরকার বায়ুই এই বরফ জমার পক্ষে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সুতরাং সমুদ্র-সমতলেই বরফ বা তুষারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানে

১৬০০০ ফুটের উর্ধ্বে পর্বতগাত্রেই উহা বরফ হিসাবে সারা বৎসর স্থায়ীভাবে থাকে। অন্যান্য অক্ষরেখায়, যেমন—আল্পস পর্বতের শিরোদেশে (৪৬° ফাঃ) ৮৫০০ ফুট উচ্চেই বরফ স্থায়ীভাবে থাকে।

খর ও মৃদু জল (Hard and soft water)

তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে কোন কোন জলে অতি সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয়, আবার কোন কোন জলে কিছুতেই ফেনা হইতে চায় না। যে জলে সহজেই সাবানের ফেনা হয় তাহাকে মৃদু জল (soft water) বলে এবং যাহাতে ফেনা কিছুতেই হইতে চায় না তাহাকে খর জল (hard water) বলে। বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা মৃদু জল। নদী, ঝরণা ও কূপের জল কোথাও বা মৃদু, কোথাও বা খর। ইহার কারণ এই যে, নদী প্রভৃতির জলে প্রায়ই নানাবিধ লবণজাতীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, যথা—ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর বাইকার্বোনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট। এই সকল বস্তু সহজেই সাবানের সহিত রাসায়নিক সংযোগে অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত হয়; সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জল হইতে এই সকল বস্তু সাবানের সংযোগে নিঃশেষিত না হয়, ততক্ষণ সাবান জলে দ্রব হয় না, কাজেই ফেনাও হয় না। সুতরাং অনেকটা সাবান অযথা ব্যয় হইবার পর ইহাতে ফেনা হয়। ইহাই খর জল।

খর জল দুই প্রকার : (১) অস্থায়ী খর জল (temporary hard water) ও (২) স্থায়ী খর জল (permanent hard water)। অস্থায়ী খর জলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের বাইকার্বোনেট দ্রবীভূত থাকে এবং স্থায়ী খর জলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট দ্রবীভূত থাকে।

খর জলকে মৃদু করিবার পদ্ধতি (Methods of softening hard water)—

অস্থায়ী খর জলকে মৃদু জলে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে অনেকক্ষণ ফুটাইতে হয়। ইহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং অদ্রাব্য ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের কার্বোনেট পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়ে।

স্থায়ী খর জলকে ফুটাইয়া মৃদু করা যায় না। ইহাকে মৃদু করিতে হইলে জলের সহিত কিছু সোডা (sodium carbonate) অথবা চুন মিশাইতে হয়। ইহার ফলে সোডা ও চুনের সহিত খর জলের ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম লবণগুলির রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া উহারা ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট (calcium carbonate) ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বোনেটে (magnesium carbonate) পরিণত হইয়া থিতাইয়া পড়ে।

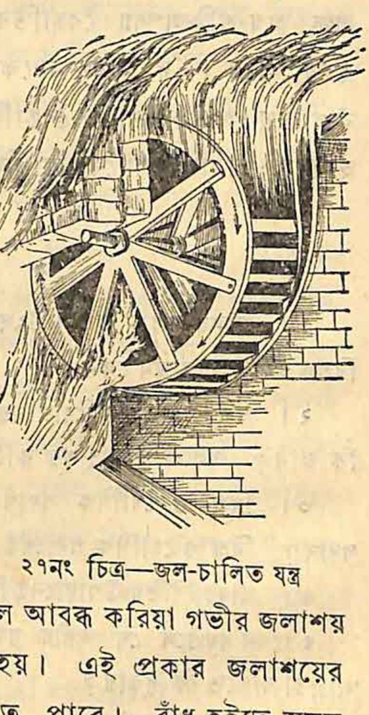
আজকাল সোডিয়াম পারমুটিট (sodium permutit) নামক পদার্থের মধ্য দিয়া খর জল (স্থায়ী বা অস্থায়ী) পরিচালনা করিয়া সহজেই মৃদু জল পাওয়া যায়।

জল-চালিত যন্ত্র ও বাঁধ হইতে শক্তি উৎপাদন (Water mills and dams as generators of energy)—

তোমরা জান, জল সকল সময়েই উচ্চ স্থান হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। নদী, ঝরণা প্রভৃতির জল স্রোতের সৃষ্টি করিয়া দ্রুত বহিয়া চলে। এই জলস্রোতে **গতিশক্তি** (kinetic energy) আছে। জলস্রোতের এই শক্তি হইতে **যান্ত্রিক শক্তি** (mechanical energy) এবং **বৈদ্যুতিক শক্তি** (electrical energy) উৎপন্ন করা যায়। জল হইতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় তাহাকে জল-বিদ্যুৎ (hydro electricity) বলে।

জল হইতে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করিতে হইলে খরস্রোতা নদীর জলস্রোতের পথে জাহাজের চাকার মত একটা চাকা (wheel) বসাইতে হয়। স্রোতের প্রবল ধাক্কায় চাকা ঘোরে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার অক্ষদণ্ড ঘুরিতে থাকে। ঘূর্ণায়মান অক্ষদণ্ডের সহিত দন্ত-চক্র ও মোটা ফিতা লাগাইয়া নানাপ্রকার যন্ত্র চালান যায়। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে গম পেষা, শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করা, বীজ হইতে তৈল বাহির করা, প্রভৃতি কাজ করা যায়।

জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিতে হইলে ঘূর্ণায়মান চক্রের সঙ্গে একটা ডাইনামো (dynamo) বা বিদ্যুৎ-উৎপাদন-যন্ত্র সংযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকারে যান্ত্রিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।



২৭নং চিত্র—জল-চালিত যন্ত্র

সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলের নদীতে প্রবল স্রোত থাকে। কিন্তু উহা সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছাইলে স্রোতের বেগ অনেক কমিয়া যায়। সেইজন্য স্রোতঃশক্তি অধিক পরিমাণে পাইতে হইলে নদীর জল আবদ্ধ করিয়া গভীর জলাশয় বা উচ্চ বাঁধ (dam) প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রকার জলাশয়ের জল নীচের দিকে প্রবল চাপ দিতে পারে। বাঁধ হইতে সুড়ঙ্গ বা নলের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হইলে উহা প্রবল বেগে নামিয়া আসে। জল নামিবার পথে একটি টারবাইন (turbine) অর্থাৎ

এক প্রকার বাঁকান বহু ফলকযুক্ত চাকা বসান থাকে। টারবাইনের চারিদিক ঘেরা থাকে এবং নল-বাহিত জলরাশি ঐ আবেষ্টনীর মধ্য দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া উহার অক্ষদণ্ডটিকে খুব জোরে ঘুরায়। টারবাইনের অক্ষদণ্ডের সহিত সংযুক্ত ডাইনামো চলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। টারবাইনে উৎপন্ন যান্ত্রিক শক্তিই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। জলপ্রপাতের জলকে নল-মধ্যে প্রবাহিত করিয়া যে বেগবান্ স্রোত উৎপন্ন হয় তাহার পথে বিশালকায় টারবাইন স্থাপিত করিয়া লক্ষ লক্ষ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি আজকাল নানা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দামোদর নদকে এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বাঁধ দিয়া আটকাইয়া যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ।

প্রশ্ন

১। জলের প্রধান প্রধান উৎস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। জীবনধারণে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন কেন?

২। জল পরিশুদ্ধি করিবার জন্য কি কি প্রক্রিয়া আছে? উহাদের সম্বন্ধে কি জান? জলকে জীবাণু-শূন্য করিবার উপায়সমূহ বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা কর।

৩। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ কাহাকে বলে? বায়ু কি একটি মিশ্র পদার্থ? মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা কর।

৪। বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের বিশিষ্ট ধর্মগুলি বর্ণনা কর।

৫। বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহার প্রমাণ কি? বায়ুর আর্দ্রতা বলিতে কি বুঝায়?

৬। নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ—

(ক) শিশির, (খ) কুয়াশা, (গ) মেঘ, (ঘ) বৃষ্টি, (ঙ) তুষার।

৭। খর ও মৃদু জল কাহাকে বলে? কিরূপে খর জলকে মৃদু করা যায়?

তৃতীয় অধ্যায়

শক্তি (Energy)

জগতের যাহা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করি, তাহা হয় পদার্থ, নয় শক্তি। গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদ্, প্রাণী, জল, বায়ু প্রভৃতি সমস্তই পদার্থ। আর পদার্থের উপর প্রভাবের ফলে যাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়,—যেমন তাপ, শব্দ, আলোক, চুম্বক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি—তাহারাই শক্তি। পদার্থ ও শক্তি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। পদার্থ ব্যতীত শক্তির বিকাশ হয় না ; আবার শক্তিহীন পদার্থও কল্পনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পদার্থ ও শক্তির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে—পদার্থের ওজন আছে, শক্তির ওজন নাই।

কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি। গতিশীল পদার্থ মাত্রেরই কাজ করিবার শক্তি থাকে। এই গতিমূলক শক্তিকে **গতিশক্তি** (kinetic energy) বলে। একটি পাথরের টুকরা হাতে থাকিলে উহার কোন শক্তি থাকে না, কিন্তু উহা জোরে জানালার কাচে ছুড়িলে কাচ ভাঙিয়া যায়। গতির জন্য পাথরের টুকরাটি শক্তি পাইয়াছে। বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন উহা গতিশক্তি পাইয়া থাকে। বায়ুর এই গতিশক্তির সাহায্যে পালের নৌকা চলে, বায়ু-কল চলে, ঘরবাড়ী ভাঙিয়া পড়ে এবং বড় বড় গাছ উপড়াইয়া যায়। পদার্থ গতিশূন্য অবস্থায় থাকিলেও উহার মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তিকে **স্থৈতিক শক্তি** (potential energy) বলে। কোন ইটকে ছাদের উপর রাখিলে উহাতে স্থৈতিক শক্তি থাকে। এইজন্য ইহা উপর হইতে কাহারও মাথার উপর পড়িলে মাথা ফাটিয়া যায়।

ঘড়িতে দম দিলে উহার স্প্রিং-এর মধ্যে স্থৈতিক শক্তি থাকে। স্প্রিংটি খুলিয়া যাইবার সময় এই শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং ইহার ফলে ঘড়ি চলে।

শক্তির উৎস (Sources of energy)

শক্তির দুইটি প্রধান উৎস—**সূর্য** (sun) ও **মহাকর্ষ** (gravity)। আমরা আর যত রকমের শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই তাহাদের মূলে আছে সৌরশক্তি বা সূর্যের শক্তি।

আমাদের দেহে শক্তি আছে, ইহার ফলে আমরা চলাফেরা ও নানা কাজ করি। এই শক্তি আমরা খাদ্যের দহন হইতে পাইয়া থাকি। একদিন না খাইলে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কয়েক দিন না খাইলে আমরা এত দুর্বল হইয়া পড়ি যে চলাফেরার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। সূর্যকিরণের সাহায্যে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হইবার সময় সূর্যের শক্তি উহার মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে নিহিত থাকে। যখন আমরা এই খাদ্য খাই তখন দেহের মধ্যে ইহার সহিত মৃদু দহনক্রিয়া হয়। ইহার ফলে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই তাপশক্তি আমাদের চলাফেরার ও কাজ করিবার শক্তি যোগায়। ষ্টীম-এঞ্জিনের শক্তি আছে যাহার ফলে জাহাজ চলিতেছে, রেলগাড়ী চলিতেছে। এঞ্জিনের মধ্যে কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহাতে জল ষ্টীমে পরিণত হয়। ষ্টীমের চাপে এঞ্জিনের চাকা ঘোরে। মোটর গাড়ীর এবং এরোপ্লেনের এঞ্জিনের শক্তির কথা তোমরা জান। ইহাদের মধ্যে পেট্রোল পোড়াইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহার ফলে

পেট্রোল গ্যাসে পরিণত হইয়া চাপের সৃষ্টি করে এবং এঞ্জিনের চাকা ঘোরায়। কয়লা প্রভৃতি দাহ্য বস্তুগুলি গাছপালার রূপান্তর এবং ঐ সকল বস্তুতে সূর্যের শক্তি বহুকাল হইতে সঞ্চিত আছে। সুতরাং সৌরশক্তিই এই সব শক্তির মূল।

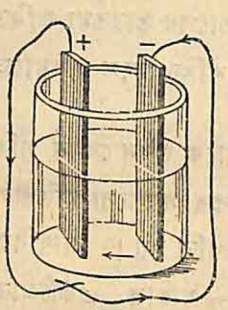
প্রবহমান বায়ুর শক্তি কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহা তোমাদিগকে পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং **প্রবহমান বায়ু** শক্তির একটি উৎস। বায়ু-প্রবাহের কারণ হইতেছে তাপের তারতম্য-জনিত বায়ু-চাপের প্রভেদ। সুতরাং পরোক্ষভাবে এই শক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি।

কামানের গোলা যখন মাটিতে পড়িয়া থাকে তখন কোন গতি নাই। কিন্তু উহাকে কামানে পুরিয়া বিস্ফোরকের সাহায্যে গতিশীল করা হইলে কি ভীষণ প্রলয়কারী শক্তির উৎপত্তি হয়! আণবিক বোমার কথা তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ—যাহার একটিমাত্র বিস্ফোরণের ফলে জাপানের দুইটি সমৃদ্ধ নগর হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস হইয়াছে। আণবিক বোমার এই শক্তি জন্মিয়াছে পরমাণুর ভাঙা-গড়ার ফলে। এই দৃষ্টান্তগুলির মূলে রহিয়াছে পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তি। সুতরাং শক্তির আর একটি উৎস **রাসায়নিক শক্তি**। রাসায়নিক শক্তির মূল যে কোথায় তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে পৃথিবী যেমন সূর্যের শক্তি লইয়া সূর্য হইতে বাহির হইয়াছে তখন পরোক্ষভাবে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি নিহিত আছে তাহারি মূলে যে সৌরশক্তি রহিয়াছে —এই চিন্তাই স্বাভাবিক।

খরস্রোতা নদী, জলপ্রপাত প্রভৃতি শক্তির অপর উৎস। খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাতের শক্তি কিভাবে কাজে লাগান যায় তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এইসব শক্তির মূলে রহিয়াছে পৃথিবীর মহাকর্ষ

(gravity), যাহার ফলে পাহাড়ের জল নিম্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিতেছে এবং নদীর জল উচু স্থান হইতে ধাবমান হইয়া সাগরে মিশিতেছে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ বিজলী বাতির তার গরম করিয়া আলো দেয়, ইলেক্‌ট্রিক মোটর চালায় এবং উহার সাহায্যে ট্রামগাড়ী, পাখা ও নানাপ্রকার কল চলে। সুতরাং বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। বিদ্যুৎ শক্তির উৎস বিদ্যুৎ-কোষ (electric cell) (২৮নং চিত্র)। তোমরা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যখন আরও উচু ক্লাসে আলোচনা করিবে তখন জানিতে পারিবে যে এই শক্তি রাসায়নিক শক্তি হইতেই উদ্ভূত।



২৮নং চিত্র—
বিদ্যুৎ-কোষ

চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে এবং উহার ফলে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কার্যকরী হয়। সুতরাং চুম্বককে শক্তির একটি উৎস বলা যাইতে পারে।

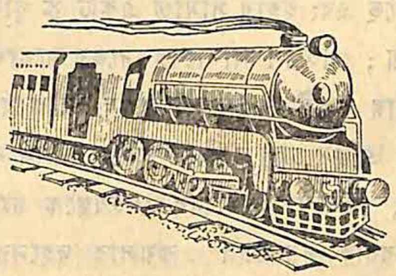
আলোকের সাহায্যে আমরা সকল বস্তু দেখিতে পাই। আলোক গাছের পাতা সবুজ করে, ফটোগ্রাফির কাচকে কাল করে। সুতরাং আলোককে শক্তির আর একটি উৎস বলা যাইতে পারে।

শব্দ কানের পর্দাকে কাঁপায়; ইহার ফলে আমরা শুনিতে পাই। নিকটে মেঘগর্জন হইলে উহার শব্দে কাচের দরজা-জানালা ঝনঝন করিয়া উঠে। সেতারের তার আঙুল দিয়া টানিলে উহাতে নানাপ্রকার ঝংকার উঠে। সুতরাং শব্দও শক্তির আর একটি উৎস।

যন্ত্র (Machines)

প্রকৃতির নানাপ্রকার শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য যন্ত্র আবশ্যক।

এঞ্জিন—একটা এঞ্জিন কিরূপে দ্রুতগতিতে রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই এঞ্জিন চালাইতে হইলে কয়লারূপ ইন্ধন (fuel) দরকার। কয়লা পুড়িবার সময় তাপ উৎপন্ন হয় এবং ইহার সাহায্যে জল ফুটিয়া ষ্টীমে পরিণত হয়। ষ্টীমের চাপে চাকা ঘুরিতে থাকে এবং ইহার ফলে এঞ্জিন চলিতে থাকে। এঞ্জিন এই শক্তি কোথা হইতে পাইল? প্রথমে কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং পরে উহা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।



২৯নং চিত্র—রেলগাড়ীর এঞ্জিন

ঘড়ি কল—ঘড়িও একপ্রকার যন্ত্র। ইহাতে একটি ইস্পাতের স্প্রিং (spring) থাকে। তোমরা জান দম দিলে ঘড়ি চলিতে থাকে, কিন্তু না দিলে ঘড়ি চলে না, বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ কি? দম দিবার সময় যে জোর লাগে, সেই দৈহিক শক্তি ঘড়ির স্প্রিংকে জড়াইয়া দিয়া উহার মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে নিহিত থাকে। স্থিতিস্থাপক গুণের জন্য স্প্রিংটি যখন ধীরে ধীরে খুলিয়া যায়, তখন ঘড়ি চলিতে থাকে। এই সময় স্প্রিং-এর স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্প্রিংটি যখন একবারে খুলিয়া যায় তখন উহাতে আর কোন স্থৈতিক শক্তি থাকে না,

সুতরাং ঘড়িও আর চলে না। এইজন্য ঘড়িতে নিয়মিত দম দিতে হয়।

যন্ত্র ও জীবযন্ত্রের তুলনা (Machine and living machine compared)—

আমাদের দেহ একটা জীবন্ত যন্ত্রবিশেষ। ইহাকে এঞ্জিনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এঞ্জিনের ভিতরে নানাপ্রকার কলকব্জা আছে এবং ইহার সামান্য একটি স্ক্রু খুলিয়া যাইলে এঞ্জিন বন্ধ হইয়া যায় ; সেইরূপ আমাদের দেহের মধ্যেও নানাপ্রকার কলকব্জা আছে, ইহার একটি বিকল হইলে দেহের কার্য ব্যাহত হয়।

এঞ্জিন চালু রাখিতে হইলে যেমন কয়লা ও জল সরবরাহ করিতে হয়, তেমনি আমাদের দেহযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য খাদ্য ও জল সরবরাহ দরকার। কয়লার দহনের ফলে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাহাতে এঞ্জিন চলে, সেইরূপ খাদ্যের দহনের ফলে আমাদের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়। কয়লা ফুরাইয়া যাইলে এঞ্জিন যেমন চলিতে পারে না, সেইরূপ খাদ্যের অভাব হইলে আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি, এমনকি নড়া-চড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না। এঞ্জিনের কয়লা দহন-কালে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে, সেইরূপ খাদ্য দহনের সময়েও এই দুই প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়।

যদিও আমাদের দেহযন্ত্রের সহিত এঞ্জিনের উপরোক্ত সাদৃশ্য আছে তথাপি ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যেরও অভাব নাই। এঞ্জিনের কোন কলকব্জা খারাপ হইয়া যাইলে উহা বদলান যায়, কিন্তু আমাদের দেহের কোন কলকব্জা খারাপ হইলে উহা বদলান যায় না। কয়লা কখনও এঞ্জিনের দেহের সহিত মিশিয়া যায় না, উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে এবং পৃথক্ থাকিয়া দগ্ধ হইয়া যন্ত্রকে চালায় ; কিন্তু

জীবযন্ত্রে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়া দেহের সঙ্গে একবারে মিশিয়া যায়। কয়লা না পাইলে এঞ্জিন বিকল হয় না, কিন্তু জীবযন্ত্র খাদ্য না পাইলে দেহ কেবলমাত্র দুর্বল হইয়া পড়ে না, অচিরে বিনষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এঞ্জিনের কয়লারূপ ইন্ধনের দ্রুত দহন হয় বলিয়া বেশী তাপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু জীবযন্ত্রে খাদ্যরূপ ইন্ধনের মৃদু দহন হয় বলিয়া সামান্য তাপের সৃষ্টি হয়।

তাপ (Heat)

তাপ একপ্রকার শক্তি। তাপ কি তাহা না জানিলেও ইহার সহিত তোমরা পরিচিত। রৌদ্রে বা জলন্ত উনানের পাশে দাঁড়াইলে আমরা তাপ অনুভব করি। ধর, একটি বাটিতে খানিকটা জল ফুটাইয়া রাখা হইয়াছে। এখন তুমি না জানিয়া ঐ বাটিটি ধরিলে তোমার হাত পুড়িয়া যাইবে। বাটিটি যে গরম ছিল, উহাকে দেখিয়া তুমি বুঝিতে পার নাই, কিন্তু স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলে উহা খুব গরম। সুতরাং তাপ চোখে দেখা যায় না, স্পর্শের সাহায্যে উহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

তাপের উৎস (Sources of heat)

(১) **সূর্য** (Sun)— সূর্যই তাপের প্রধান উৎস। সূর্য একটি বিশাল আগুনের কুণ্ড বিশেষ। উহা হইতে প্রচণ্ড তাপ অনবরত চারিদিকে বাহির হইতেছে। পৃথিবী সূর্য হইতে বহু দূরে থাকিলেও আমরা এই তাপ অনুভব করিয়া থাকি। প্রখর সূর্যতাপে পাথর, মাটি ও বালি খুব গরম হয়, ইহা তোমরা জান।

(২) **বিদ্যুৎ** (Electricity)— বিদ্যুৎ তাপের দ্বিতীয় উৎস। সরু তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবার সময় উহা এত গরম হয় যে, প্রথমে লাল হয় এবং পরে আলোক বিকিরণ করে। এই

প্রকারেই আমরা ইলেক্‌ট্রিক আলো পাইয়া থাকি। ইলেক্‌ট্রিক কেটলি, ইস্ত্রি, চুলা প্রভৃতি নানারকমের নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় নিকেল (nickel) ও ক্রমিয়মের (chromium) এক মিশ্রিত ধাতুর তারের মধ্য দিয়া। এই মিশ্রিত ধাতুর গুণ এই যে, বেশী পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হইলেও ইহা পুড়িয়া যায় না, টকটকে লাল হইয়া তাপ বিকিরণ করে।

(৩) **যান্ত্রিক ক্রিয়া** (Mechanical action)— ঘর্ষণ-ক্রিয়া তাপের তৃতীয় উৎস। যন্ত্রপাতি শাণ দিবার সময় উহা হইতে এত তাপ উৎপন্ন হয় যে আগুনের ফুলকি বাহির হয়। শীতকালে আমরা অনেক সময় হাত ঘষিয়া গরম করিয়া থাকি। দুইখানি চকমকি পাথর ঘষিয়া আগুন উৎপন্ন করা যায়।

(৪) **রাসায়নিক ক্রিয়া** (Chemical action)— দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া তাপের চতুর্থ উৎস। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা কয়লা বা কাঠ পোড়াইয়া দেহ গরম রাখে। এখানে কয়লা অথবা কাঠের কার্বনের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের দ্রুত রাসায়নিক সংযোগে তাপ উৎপন্ন হয়।

তাপ প্রয়োগের ফল (Effects of heat)—

পদার্থ মাত্রেরই তাপের উপর চারি প্রকার প্রভাব দেখা যায় :—

(১) **তাপে পদার্থের ভাস্বরতা** (Incandescence)— এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা নিজে জ্বলে না কিন্তু উত্তপ্ত করিলে তাপ ও আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে ; ইহাকে **ভাস্বরতা** বা দীপ্তি বলে। তোমরা একটা লোহার বল উত্তপ্ত করিলে দেখিবে যে, উহা প্রথমে লাল হইয়াছে এবং পরে আলোক বিকিরণ করিতেছে। এই উত্তপ্ত বলটিকে অন্ধকার স্থানে রাখিলে আলোক-বিকিরণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। উত্তপ্ত চুনের উপর মিশ্রিত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

গ্যাস প্রয়োগ করিলে **চুনালোক** (limelight) নামক তীব্র আলোক পাওয়া যায়। এই আলোক পূর্বে ছায়াচিত্রের (cinema) কার্যে ব্যবহৃত হইত।

(২) **তাপে পদার্থের জ্বলন** (Burning)—তোমরা জান কাঠ, কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি দাহ্য বস্তু জ্বালাইতে হইলে অগ্নিসংযোগ আবশ্যক। কারণ, জ্বলন আরম্ভ হইবার পূর্বে উহাদের প্রত্যেকটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিতে হয়। এক টুকরা কাঠ জ্বালাইতে হইলে যতটা তাপের দরকার হয়, স্পিরিট বা পেট্রোল জ্বালাইতে হইলে ততটা তাপ দরকার হয় না। নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ দিয়া একবার জ্বালাইয়া দিলে উহাদের উপাদানগুলির সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া যে তাপের সৃষ্টি হয় তাহা জ্বলন কার্যকে চালু রাখে। জ্বলনের সময় দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া হয় বলিয়া আগুনের শিখা দেখিতে পাওয়া যায়।

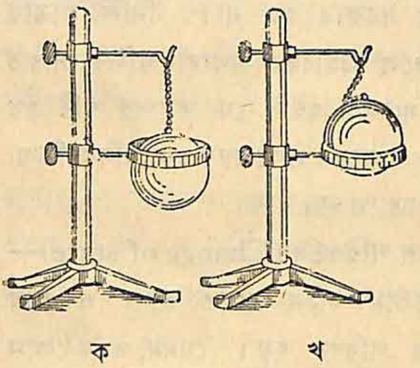
(৩) **তাপে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন** (Change of state)—তাপ পাইলে একই পদার্থ প্রথমে কঠিন হইতে তরল ও পরে তরল হইতে গ্যাসীয় আকারে পরিণত হয়। যেমন, বরফ কোন খোলা পাত্রে রাখিয়া দিলে উহা বাহিরের তাপেই যে জল হইয়া যায়, ইহা তোমরা দেখিয়াছ। সেই জল কোন পাত্রে রাখিয়া জ্বলন্ত উনানের উপর চাপাইলে ক্রমশঃ ষ্টীমে পরিণত হয়। শুধু যে বরফই তাপের ফলে গলিয়া কঠিন হইতে তরল ও পরে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়, তাহা নহে। এমন যে শক্ত ধাতু লোহা তাহাও তাপ পাইলে কঠিন হইতে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং এই প্রকারে তরল করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া কড়ি, বরগা প্রভৃতি নানা রকম জিনিষ তৈয়ারী করা হয়। খুব বেশী তাপ দিলে লোহা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। তবে কয়েকটি কঠিন পদার্থ, যথা—

কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথেলিন প্রভৃতি তাপে তরল না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

(৪) **তাপে পদার্থের আকারের পরিবর্তন (Change of size)**

তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ—কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাতুনির্মিত জিনিষের প্রসারণ সবচেয়ে বেশী, সুতরাং ধাতু-নির্মিত বস্তু লইয়া তাপের ফলে আকৃতি-বৃদ্ধি পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

১৭নং পরীক্ষা—একটি পিতলের বল ও আংটা লও। বলটি এরূপ মাপের হইবে যেন সাধারণ অবস্থায় উহা আংটার ভিতর দিয়া ঠিক গলিয়া যায় (৩০নং চিত্র—ক)। এখন বলটিকে আগুনে গরম করিলে দেখিবে যে, উহা আর আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতেছে না (৩০নং চিত্র—খ)। কেন-না, গরম হওয়ার ফলে বলের আয়তন বাড়িয়াছে, কিন্তু আংটার আয়তন আগেকার মত আছে। এইবার বলটিকে ঠাণ্ডা করিলে দেখিবে যে, উহা আবার আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতেছে। কেন-না, ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে বলটি আয়তনে কমিয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।



ক খ

৩০নং চিত্র—
তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ
(ক) তাপ প্রয়োগের পূর্বে
(খ) তাপ প্রয়োগের পরে

তোমরা গরুর গাড়ীর চাকার উপর একটি লোহার বেড় দেখিয়া থাকিবে। উহা কিভাবে পরান হয় জান? লোহার এমন একটি বেড় লওয়া হয়, যাহা চাকার বেড়ের ঠিক সমান। তারপর লোহার

বেড়টিকে আগুনে গরম করা হয়। গরম হইলে উহার আয়তন বাড়ে। তখন সাঁড়াশী দিয়া ধরিয়া উহাকে চাকায় পরাইয়া দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হইলে লোহার বেড়টির আয়তন কমে এবং চাকাকে একেবারে কামড়াইয়া ধরে। যাহাতে তপ্ত লোহার বেড় পরাইবার সময় চাকার কাঠটি পুড়িয়া না যায়, সেইজন্য জল ঢালিয়া চাকা ঠাণ্ডা রাখা হয়।

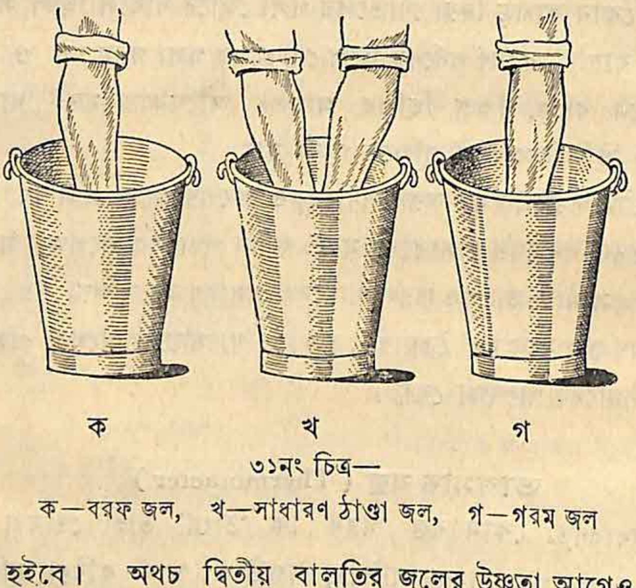
তোমরা বোধ হয় জান যে, কাচের বোতলের ছিপি আঁটিয়া গেলে কোন কাপড় দিয়া বোতলের গলা জোরে ঘষিলে ছিপি সহজে খোলা যায়। কারণ ঘর্ষণের ফলে বোতলের গলা গরম হয় ও উহা আয়তনে বাড়ে, কিন্তু ছিপির আয়তন আগেকার মতই থাকে। সুতরাং ছিপিটি সহজেই খুলিতে পারা যায়।

কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থেরও তাপের ফলে প্রসারণ হয়। কিন্তু তরল পদার্থের প্রসারণের মাত্রা কঠিন পদার্থের অপেক্ষা অনেক বেশী। সামান্য তাপেও তরল পারদের প্রসারণ হয় বলিয়া উহা দিয়া 'সাধারণ তাপমান যন্ত্র' তৈয়ারী হয়। গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ তরল পদার্থের অপেক্ষা বেশী।

তাপমান যন্ত্র (Thermometer)

সাধারণতঃ কোন বস্তু 'গরম' কি 'ঠাণ্ডা' তাহা তোমরা কি করিয়া বোঝ? তোমরা বলিবে, বস্তুটিকে স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারা যায়। গরম মনে হইলে উহাকে বল 'গরম', ঠাণ্ডা লাগিলে উহাকে বল 'ঠাণ্ডা'। এইভাবে স্পর্শ দ্বারা বস্তুটির উষ্ণতা বা তাপমাত্রা (temperature) সম্বন্ধে একটা ধারণা কর। কিন্তু এই ধারণা যে অনেক সময় ভুল হইতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

১৮নং পরীক্ষা—তিনটি বালতিতে বিভিন্ন উষ্ণতার জল লও। যথা, প্রথম বালতিতে বরফ জল, দ্বিতীয় বালতিতে সাধারণ ঠাণ্ডা জল এবং তৃতীয় বালতিতে গরম জল (৩১নং চিত্র)। কিছুক্ষণ তোমার ডান হাতটি বরফ জলের বালতিতে এবং বাম হাতটি গরম জলের বালতিতে রাখ। তারপর দুই হাত উঠাইয়া একসঙ্গে সাধারণ ঠাণ্ডা জলের বালতির মধ্যে রাখ। এখন ডান হাত দিয়া ঐ জল গরম মনে হইবে এবং বাম হাত দিয়া ঐ একই জল ঠাণ্ডা



ক খ গ

৩১নং চিত্র—

ক—বরফ জল, খ—সাধারণ ঠাণ্ডা জল, গ—গরম জল

মনে হইবে। অথচ দ্বিতীয় বালতির জলের উষ্ণতা আগেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। কেবল অবস্থাভেদে এইরূপ বিভিন্ন রকমের মনে হইতেছে।

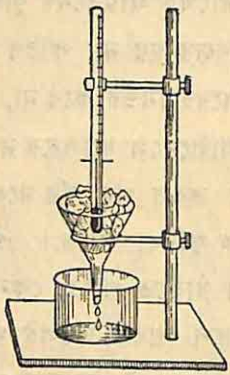
এই প্রকারের আরও অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায় যে, স্পর্শ দ্বারা পদার্থের উষ্ণতা সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে ভুল ধারণা হওয়া সম্ভবপর। কাজেই এমন একটা যন্ত্র থাকা আবশ্যক যাহা কখনও ভুল করিবে না

এবং সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করিবে। ইহারই নাম **থার্মোমিটার** বা তাপমান যন্ত্র।

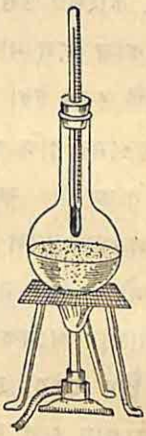
তাপের একটি ফল এই যে, বস্তুসমূহ উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়িয়া যায় কিন্তু সকল বস্তুর বৃদ্ধি সমান নহে। কঠিন পদার্থের বৃদ্ধি সবচেয়ে কম, কাজেই উত্তাপজনিত বৃদ্ধি চোখে দেখিতে হইলে কঠিন পদার্থ লইয়া কাজ চলে না। গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি যদিও সর্বাপেক্ষা বেশী তবুও ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, কারণ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি শুধু তাপের উপরেই নির্ভর করে না, চাপের উপরও নির্ভর করে। কাজেই এসব গোলমেলে ব্যাপারে না যাইয়া তরল পদার্থ লওয়াই ভাল এবং নানাবিধ তরল পদার্থের মধ্যে পারদ লওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেন-না ইহার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, উহাতে তাপমাত্রার অনেক ব্যবধান মাপা যাইতে পারে, কেন-না যে উত্তাপে জল ষ্টীম হইয়া যায় সেই উত্তাপে পারদ তরলই থাকে ; আবার যে ঠাণ্ডায় জল জমিয়া কঠিন হয় সেই ঠাণ্ডাতেও পারদ তরল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, পারদের তাপ পরিবহন শক্তি বেশী বলিয়া যে বস্তুর তাপ মাপিবার দরকার তাহার সংস্পর্শে আসিলে বস্তুটি যতটা গরম, পারদ খুব তাড়াতাড়ি ততটা গরম হয়।

থার্মোমিটার প্রস্তুতকরণ—চুলের মত সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি সরু কাচনল লইয়া উহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়। পরে উহার এক প্রান্ত আগুনে গলাইয়া ফুঁ দিয়া একটি বাল্‌ব (bulb) বা কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। নলের অপর প্রান্তে একটি ছোট ফানেল সংযুক্ত করিয়া উহার মধ্যে বিশুদ্ধ পারদ ঢালা হয়। এখন বাল্‌বটিকে পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল করিয়া উহা পারদপূর্ণ করা হয় এবং বাল্‌বের পারদকে ফুটাইয়া খোলা মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ করা হয়। পরে ফানেলটি সরাইয়া লইতে হয়। নলের মধ্যে পারদ ও উহার বাষ্প

রহিল। এখন বাল্‌বটিকে গলন্ত বরফে ডুবাইলে পারদের আয়তন সংকুচিত হইয়া সরু নলের মধ্যে যেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ায় সেখানে একটি দাগ কাটা হয় (৩২নং চিত্র)। এই দাগকে হিমাংক (freezing point) বলে। আবার বাল্‌বটিকে ফুটন্ত জলের ষ্টীমের



৩২নং চিত্র—হিমাংক নির্ণয়



৩৩নং চিত্র—স্ফুটনাংক নির্ণয়

মধ্যে রাখিলে পারদ প্রসারিত হইয়া নল-মধ্যে যেখানে উঠে সেখানে আর একটি দাগ কাটা হয় (৩৩নং চিত্র)। এই দাগকে স্ফুটনাংক (boiling point) বলে। পরে এই দুই দাগের ব্যবধানকে সমান কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিলে **ডিগ্রী** (degree) বলা হয়।

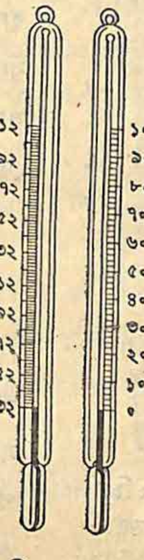
ফারেণহাইট ও সেণ্টিগ্রেড স্কেল (Fahrenheit and Centigrade scales)

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাগ (scale) কাটা হয়। নিম্নে দুই প্রকার স্কেলের বিষয় বলা হইল।

(১) **সেণ্টিগ্রেড স্কেল** (Centigrade scale)—এই স্কেল অনুসারে হিমাংক ০ ডিগ্রী এবং স্ফুটনাংক ১০০ ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানকে

সমান ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়। ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে এই প্রকার স্কেল ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানের কাজকর্মে সাধারণতঃ এই স্কেলই ব্যবহৃত হয়।

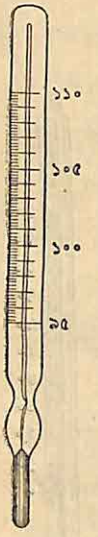
(২) ফারেণহাইট স্কেল (Fahrenheit scale)—এই স্কেল অনুসারে হিমাংক ৩২ ডিগ্রী এবং স্ফুটনাংক ২১২ ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। ইংলণ্ডে এই প্রকার স্কেল ব্যবহৃত হয়।



৩৪নং চিত্র—ফারেণহাইট ও সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার

আমাদের জ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহাকে ক্লিনিক্যাল বা ডাক্তারী থার্মোমিটার (Clinical thermometer) বলে (৩৫নং চিত্র)। ইহাতেও ফারেণহাইট স্কেল আছে। তবে মানবদেহে তাপের মাত্রা বেশী উঠা-নামা করে না বলিয়া উহাতে ৯৫ অংক হইতে ১১০ অংক পর্যন্ত দাগ থাকে। দেহের সংস্পর্শে পারদ যে দাগে আসিয়া দাঁড়ায় দেহের তাপের মাত্রা তাহাই বলিয়া ধরা হয়। সূক্ষ্মভাবে মাপিবার জন্য এক এক ডিগ্রীকে আবার ৫ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যে স্থানে তীর-চিহ্নিত দাগটি থাকে তাহাই আমাদের সুস্থ শরীরেরতাপ নির্দেশ করে ; সাধারণতঃ উহা ৯৮·৪ ডিগ্রী। সাধারণ থার্মোমিটার কোন বস্তুর সংস্পর্শ হইতে সরাইয়া লইলে পারদ নল হইতে নামিয়া বাল্বের মধ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু ডাক্তারী থার্মোমিটারে এইরূপ

হইলে দেহের তাপ সঠিক জানা বড়ই কঠিন হইত। সেইজন্য এই যন্ত্রে বাল্‌ব ও নলের সংযোগ-স্থলে নলের মুখ খুব সরু ও বাঁকা করা হয়। ফলে পারদ উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হইলে নলের মধ্যে প্রবেশ করে বটে কিন্তু সংকুচিত হইয়া সহজে বাল্‌বের মধ্যে ফিরিয়া আসে না। এইজন্য পুনরায় ব্যবহার করিবার সময় ঝাঁকানি দিয়া নলের পারদকে বাল্‌বের মধ্যে নামাইয়া দিতে হয়, ইহা বোধ হয় তোমরা জান।



৩৫নং চিত্র—ডাক্তারী থার্মোমিটার

তাপ-সঞ্চারণ (Transference of heat)

তপ্ত বস্তুর স্বভাবই এই যে, ইহারা তাপের কিয়দংশ চারিদিকের ঠাণ্ডা বস্তুকে দান করে, অর্থাৎ তাপ তপ্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তুতে সঞ্চারিত হয়। তাপের এই সঞ্চারণ তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে হইতে পারে, যথা—পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ।

(১) **তাপের পরিবহন** (Conduction)—ধাতুনির্মিত হাতার বাঁটের এক প্রান্ত জ্বলন্ত উনানে প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখিবে, উহার অপর প্রান্ত শীঘ্র গরম হইয়া উঠে ; এত গরম হয় যে হাত দেওয়া যায় না। উনানের আগুনের তাপই হাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়াছে। কেমন করিয়া আসিল ? হাতার যে অণুগুলি উনানের মধ্যে ছিল তাহারা উত্তপ্ত হইয়া উহাদের সংলগ্ন অণুগুলিকে তাপ দিল, ইহারা আবার উত্তপ্ত হইয়া ইহাদের সংলগ্ন অণুগুলিকে খানিকটা তাপ দিল ; এইরূপে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাপের সঞ্চারণ বা চলাচল হইলে সমস্ত দণ্ডটি উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। এই

প্রক্রিয়ায় অণুগুলি নিজ নিজ স্থানে থাকে, কখনও স্থানচ্যুত হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় **উত্তপ্ত অণুগুলি স্থানচ্যুত না হইয়া তাপ উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল অংশে সঞ্চারিত হয় তাহাকে পরিবহন বলে।**

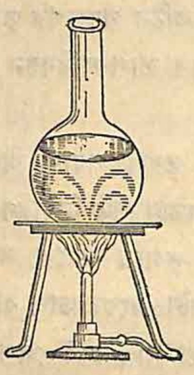
যাবতীয় কঠিন পদার্থে তাপের চলাচল এই প্রণালীতে হইয়া থাকে। তরল পদার্থের তাপ-পরিবহন শক্তি কঠিন পদার্থের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু পারদ তরল হইলেও ইহার তাপ-পরিবহন শক্তি উত্তম।

গ্যাসীয় পদার্থের তাপ-পরিবহন শক্তি তরল পদার্থ অপেক্ষা আরও কম। এইজন্য শীতকালে লেপে যতটা শীত নিবারণ হয়, পাঁচখানা কাঁথাতেও তাহা হয় না। লেপে তুলার ফাঁকে অনেক বাতাস আবদ্ধ থাকে। কাঁথার ভিতর দিয়া যতটা দেহের তাপ বাহিরে আসিতে পারে, লেপের ভিতর দিয়া ততটা পারে না; তাই লেপ ঢের বেশী গরম মনে হয়।

(২) **তাপের পরিচলন** (Convection)—জল বা অন্যান্য তরল পদার্থ পরিবহন প্রণালীতে গরম হয় না। তোমরা জান যে, এক কেটলি জল উনানে বসাইলে উহা কিছুক্ষণ পরে গরম হইয়া উঠে। কি করিয়া হয়? পদার্থের স্বভাবই এই যে উত্তপ্ত হইলে উহা লঘু হয়। কাজেই কেটলির তলার জল গরম হইয়া হালকা হয় ও উপরে উঠে এবং উপরের ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারী জল তলায় নামিয়া আসে। এই ঠাণ্ডা জল উনানের তাপ পাইয়া যখন উপরের জল অপেক্ষা গরম হয়, তখন উহা পুনরায় উপরে উঠে এবং উপরের জল তলায় নামে। এই প্রকারে নীচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নীচে জল উঠা-নামা করিতে করিতে কেটলির সমস্ত জল সমভাবে গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে। সুতরাং বলা

যাইতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত অণুগুলি স্থানচ্যুত হইবার ফলে তাপ উষ্ণতর স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সঞ্চারিত হয়, তাহাকে পরিচলন বলে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা তাপের পরিচলন প্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যায়—



৩৬নং চিত্র—তাপের পরিচলন

১৯নং পরীক্ষা—একটি ফ্লাস্কে (flask) কিছু জল লও। এখন সামান্য পরিমাণে মেজেন্টা (magenta) রঙের গুঁড়া উহার তলায় ফেলিয়া দিয়া বুনসেন বাতি বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে ফ্লাস্কটি গরম কর। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে মেজেন্টা ধীরে ধীরে গলিয়া যাইয়া উহা হইতে সূক্ষ্ম রঙিন স্রোত উপর দিকে কিছু উঠিয়া পরেপাশ দিয়া নীচে নামিতেছে (৩৬নং চিত্র)।

তাপের পরিচলন কঠিন পদার্থে সম্ভব নয়। কেন-না পরিবহন ক্রিয়া হইতে ইহার তফাৎ এই যে, ইহাতে পদার্থের অণুগুলি নিজেরাই নীচ হইতে উপরে তাপ বহন করিয়া লইয়া যায়। কঠিন পদার্থের অণুগুলি এই রকমভাবে চলাফেরা করিতে পারে না বলিয়া কঠিন পদার্থে তাপের পরিচলন হয় না।

গ্যাসীয় পদার্থগুলি পরিচলন প্রণালীতেই গরম হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রে বায়ু যে এত গরম হয়, তাহাও এইরূপে হইয়া থাকে। প্রখর রৌদ্রতাপে মাটি, পাথর, বালি খুব গরম হয়,—অবশ্য সকলেই সমান গরম হয় না, এবং ইহাদের সংলগ্ন নীচের বায়ুও কম-বেশী গরম হয় ও সেই অনুপাতে হালকা হয়।

হালকা বায়ু উপর দিকে উঠিয়া যায় এবং উপরের ঠাণ্ডা বায়ু নীচে নামিয়া ইহার স্থান অধিকার করে। ঠাণ্ডা বায়ু গরম হইয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া যায়, আবার উপরের বায়ু নীচে আসে। কয়েকবার এইরূপ উঠা-নামার পর সমস্ত বায়ুই গরম হইয়া উঠে।

(৩) তাপের বিকিরণ (Radiation)—উত্তপ্ত বস্তু হইতে তাপের যে সঞ্চারণ হয়, তাহা পরিবাহিত বা পরিচালিত হউক না কেন, উভয় প্রক্রিয়াতে পদার্থের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু তোমরা জান সূর্য হইতে পৃথিবী অনেক দূরে রহিয়াছে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোন পদার্থের সংযোগ নাই। বায়ুমণ্ডল বড় জোর আটশত মাইল উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত—তারপর কি বিরাট শূন্যতা! কাজেই সূর্যতাপ পৃথিবীতে পরিবাহিত বা পরিচালিত হইয়া আসিতে পারে না। তবে আসে কি করিয়া? আসে তৃতীয় প্রণালীতে—বিকিরিত হইয়া। বিকীর্ণ তাপ সূর্য হইতে তরংগাকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা যে মাধ্যমের ভিতর দিয়া আসে তাহাকে গরম করে না। যখন কোন বস্তুর দ্বারা ইহা বাধা পায় তখন ইহা সেই বস্তুকে গরম করে। সূর্যতাপের রশ্মি বায়ু দ্বারা বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া ইহা বায়ুকে গরম না করিয়া গরম করে পৃথিবীর মাটি, জল প্রভৃতিকে। বায়ু যে এই প্রকারে গরম হয় না তাহার প্রমাণ যত উচ্চে যাওয়া যায় বায়ু গরম হওয়া দূরে থাকুক, তত ঠাণ্ডা মনে হয়। বায়ু কি প্রকারে গরম হয়, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি।

পরিচলন হইতে তাপ বিকিরণের প্রভেদ এই যে, বিকিরণ প্রণালীতে তাপ চারিদিকে সরলরেখায় সঞ্চারিত হয়, পরিচালিত তাপ শুধু উর্ধ্ব দিকেই উঠে। আগুনের কাছে দাঁড়াইলে আমরা যে তাপ অনুভব করি তাহা বিকিরিত তাপ। কেন-না, আগুন ও আমাদের মধ্যে এমন কোন কঠিন পদার্থ নাই যাহার দ্বারা তাপ

পরিবাহিত হইতে পারে। পরিচলন হইবার উপযুক্ত বায়ু আছে বটে কিন্তু পরিচালিত তাপ শুধু উর্ধ্ব দিকেই উঠে, নীচের দিকে বা সমান্তরালভাবে আসে না ; কাজেই যে তাপ আসিতেছে তাহা বিকিরিত হইয়া আসিতেছে। যদি কোন পর্দা দ্বারা আমাদিগকে আড়াল করি, তখন আর তাপবোধ করি না। বিকিরিত তাপ যদি সরলরেখায় না যাইত, তাহা হইলে এই রকম হইত কি ?

পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের তুলনা

পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
(১) ইহা কঠিন পদার্থে হইয়া থাকে।	(১) ইহা তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে হইয়া থাকে।	(১) ইহা সূর্য ও অন্যান্য দীপ্তিমান পদার্থ হইতে হইয়া থাকে।
(২) গরম কঠিন পদার্থের সহিত ঠাণ্ডা কঠিন পদার্থের সংযোগে হইয়া থাকে।	(২) গরম তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সহিত ঠাণ্ডা তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সংযোগে হইয়া থাকে।	২) কোন বস্তুর সংযোগ ব্যতীত হইয়া থাকে।
(৩) পদার্থের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে না।	(৩) পদার্থের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে।	(৩) মাধ্যমকে গরম করে না কিন্তু কোন পদার্থ দ্বারা বাধা পাইলে উহাকে গরম করে।
(৪) তাপ পদার্থের গরম অংশ হইতে ঠাণ্ডা অংশের দিকে যায়।	(৪) তাপ নীচের গরম অংশ হইতে উপরের ঠাণ্ডা অংশে যায়।	(৪) তাপ সকল দিকে দ্রুত সরলরেখায় যায়।

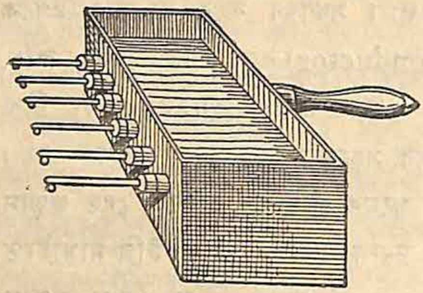
তাপের সু-পরিবাহক ও কু-পরিবাহক (Good and bad conductors of heat)—সকল পদার্থ সমান পরিমাণে তাপ সঞ্চারণ করিতে পারে না। যে সকল পদার্থ খুব শীঘ্র ও সহজে তাপ সঞ্চারণ করে তাহাদিগকে তাপের সু-পরিবাহক (good

conductor) বলে ; যথা—রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু। যে সকল পদার্থ শীঘ্র ও সহজে তাপ সঞ্চারণ করে না তাহাদিগকে তাপের কু-পরিবাহক (bad conductor) বলে ; যথা—কাঠ, কাচ, সূতা, পশম, পালক প্রভৃতি। এইজন্য উনানে কাঠের একটা দিক যখন জ্বলিতে থাকে, অপর দিকে সহজেই হাত দিতে পারা যায়। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ, অনেক কেটলির হাতলে বেত জড়ান থাকে। ইহার কারণ কি ? উনান হইতে গরম কেটলি নামাইতে পারা যায় না, কিন্তু বেত তাপের কু-পরিবাহক বলিয়া বেত জড়ান হাতলটি ধরিয়া কেটলিটি সহজে নামাইতে পারা যায়। এই একই কারণে অনেক পাত্রের হাতলে কাঠ লাগান থাকে। পাখীর পালক ও পশম সর্বাপেক্ষা তাপের কু-পরিবাহক ; সেইজন্য বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টিতে বাহিরের কনকনে শীত হইতে পশুপক্ষীদিগের রক্ষার জন্য তাহাদের ত্বকে এই রকম পশম বা পালক থাকে। আমরাও শীতকালে পশম প্রভৃতির তৈয়ারী জামা পরিধান করি। ইহা তাপের কু-পরিবাহক ; কাজেই দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ দেহেই থাকে এবং বাহিরের ঠাণ্ডা দেহ স্পর্শ করে না। এইজন্য পশম প্রভৃতির তৈয়ারী কাপড়কে আমরা গরম কাপড় বলি।

ধাতু মাত্রই তাপের সু-পরিবাহক বটে, কিন্তু তাই বলিয়া পরিবহন-ক্রিয়ার মাত্রা সব ধাতুতে সমান নয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা উহা তোমরা বুঝিতে পারিবে :—

২০নং পরীক্ষা—একটি টিনের পাত্র লও এবং উহার গায়ের ছিদ্রগুলির মধ্যে কর্কের সাহায্যে লোহা, তামা, রূপা, পিতল, টিন, কাচ প্রভৃতি দ্রব্যের সমান লম্বা দণ্ড পারাও। প্রত্যেক দণ্ডের আগায় মোমের ছোট বল লাগাও এবং পাত্রের মধ্যে খানিকটা ফুটন্ত জল ঢালিয়া দাও (৩৭নং চিত্র)। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে,

মোমের বলগুলি গলিয়া এক এক করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। যে দণ্ডটির বল সবচেয়ে আগে গলিয়া পড়িবে তাহার পরিবহন-শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী। লক্ষ্য কর, রূপার দণ্ডটির মোম সবচেয়ে আগে পড়িবে, তাহার পরে যথাক্রমে তামা, পিতল, টিন, লোহা প্রভৃতি দণ্ডের মোম গলিয়া পড়িবে। কিন্তু কাচের দণ্ডটির মোমের বল একেবারেই গলিয়া পড়িবে না, কারণ মোম গলিতে পারে এতটা তাপ ঐ প্রান্তে মোটেই যাইবে না।



৩৭নং চিত্র—বিভিন্ন ধাতুর পরিবহন-শক্তি পরীক্ষা

আলোক (Light)

আলোক এক প্রকার শক্তি। ইহা আমাদের চোখের উপর ক্রিয়া করিয়া আমাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দান করে। অন্ধকার ঘরে নানা বস্তু রহিয়াছে, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু যেই বাতি জ্বালা লইল কিংবা দিনের বেলায় জানালা খুলিয়া দেওয়া হইল, অমনি ঘর আলোয় ভরিয়া গেল এবং সমস্ত বস্তু পরিদৃশ্যমান হইল। সূর্য কিংবা বাতি দীপ্তিমান পদার্থ। ইহারা আলোক শক্তির উৎস। এই উৎস হইতে আলোক শক্তি চারিদিকে তরংগের মত ছড়াইয়া পড়ে। কতক শক্তি সোজা আমাদের চোখে পড়ে এবং ইহাদের প্রতীতি জন্মায়, আবার কতক শক্তি চারিদিকের বস্তু হইতে প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়ায় উহাদিগকে পরিদৃশ্যমান করে। বস্তুগাত্র হইতে প্রতিফলিত না হইলে উহা যে চোখে পড়ে না ইহার প্রমাণ—

অতি স্বচ্ছ বস্তু চোখে দেখা যায় না। ইহাদের ভিতর দিয়া আলোক অবাধে চলিয়া যায়, বাধা পাইয়া প্রতিফলিত হয় না। অধিকাংশ বস্তু কম-বেশী আলোক প্রতিফলিত করে, নতুবা তাহাদের আমরা মোটেই দেখিতে পাইতাম না। স্বচ্ছ বস্তুর প্রতিফলন মাত্রা কম, আর অস্বচ্ছ বস্তুর প্রতিফলন মাত্রা বেশী।

আলোক-বিকীর্ণ-শক্তি (Radiant energy)—আলোক যেরূপ সূর্য হইতে বিকিরিত হয় উত্তাপও ঠিক সেই রকম হয় এবং আলোকের যেরূপ রশ্মি আছে উত্তাপেরও সেই রকম রশ্মি আছে, তবে চোখে দেখা যায় না। উত্তাপ-রশ্মি ও আলোক-রশ্মিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উত্তাপ-রশ্মি যেমন মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না, আলোক-রশ্মিও সেইরূপ মাধ্যমকে আলোকিত করে না। বস্তুসকল যেমন আলোক-রশ্মিকে বাধা না দিলে তাহারা দৃষ্ট হয় না, সেইরকম উত্তাপ-রশ্মিও বাধা না পাইলে তাপের সৃষ্টি করে না, করে শুধু বাধা পাইলে এবং বাধার পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে তাপের পরিমাণ। আলোক-রশ্মিও উত্তাপ-রশ্মির মত সরল রেখায় যায়। ইহাদের গতিবেগ সমান—সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ইহা তরংগ আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। জলে যেমন কোন তরংগ অপর তরংগ অপেক্ষা বড় হইতে পারে তেমনি তাপ-রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্য (wave length), আলোক-রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় হয়। উভয়প্রকার রশ্মি প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয়।

পাতার সবুজ রঙ আলোক-রশ্মি শোষণ করে: সালোকসংশ্লেষ (Green colouring matter of leaves absorb rays : Photosynthesis)

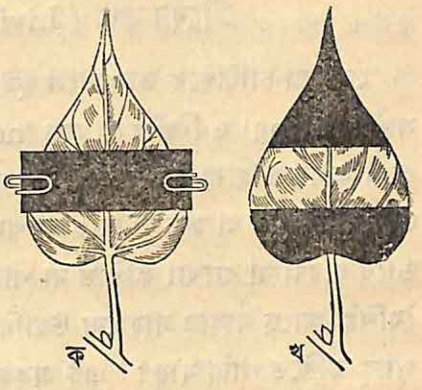
তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে, গাছের পাতা ও নরম কাণ্ড সবুজ বর্ণের হয়। ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামক এক প্রকার সবুজ

রঙের জন্য ইহাদের সবুজ দেখায়। ইহা উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ্ এই সবুজ রঙের সাহায্যে সূর্যালোক শোষণ করিয়া বায়ুস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি হইতে শোষিত রস লইয়া খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াকে **সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis) বলে। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? বায়ু-সমেত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার রন্ধ্রের (stomata) ভিতর দিয়া পাতায় প্রবেশ করে। এদিকে আবার, মূলরোম দিয়া মাটি হইতে শোষিত রস মূল, কাণ্ড ও পাতার নালিকাগুচ্ছের ভিতর দিয়া পাতায় যায়। এখন সবুজ রঙের দ্বারা শোষিত সূর্যালোকের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলের বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। ইহার ফলে শর্করা (sugar) প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন মুক্ত হইয়া বায়ুতে মিশে। পরে শর্করা শ্বেতসারে (starch) পরিণত হয়। দিনের বেলায় উদ্ভিদ্ এই প্রকারে খাদ্য প্রস্তুত করে এবং শ্বেতসার পাতায় অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত থাকে। সন্ধ্যার সময় আর শ্বেতসার প্রস্তুত হয় না। তখন উদ্ভিদ্ শ্বেতসারকে পুনরায় শর্করায় পরিবর্তিত করে। এই শর্করা দেহের বিভিন্ন অংশে চালিত হইয়া জীবিত কোষগুলিকে খাদ্য যোগায়। উদ্বৃত্ত শর্করা পুনরায় শ্বেতসারে পরিবর্তিত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য দেহে সঞ্চিত থাকে। মনে রাখিও, সালোকসংশ্লেষে উদ্ভিদের ওজন বাড়ে ও শক্তি সঞ্চয় হয়। সৌরশক্তি হইতে প্রাপ্ত এই শক্তি খাদ্যের মধ্যে নিহিত থাকে।

সূর্যকিরণ ব্যতীত উদ্ভিদ্ যে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায়ঃ—

২১নং পরীক্ষা—একটি টবের গাছকে একদিন অন্ধকারে রাখ যাহাতে পাতায় কোন শ্বেতসার না থাকে। পরের দিন প্রত্যূষে একটি পাতার মাঝখানের অংশ কাল কাগজ দিয়া এরূপভাবে

ঢাকিয়া রাখ যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে না পারে। কয়েক ঘণ্টা পরে গাছ হইতে পাতাটি ছিঁড়িয়া লইয়া কাল কাগজটি খুলিয়া ফেল। এখন পাতাটিকে কিছুক্ষণ ঈষদুষ্ণ সুরাসারে (alcohol) ডুবাইয়া রাখিয়া সবুজ রঙ নিষ্কাশন কর। এইবার এই বিবর্ণ পাতা আয়োডিনের দ্রবণে (iodine solution) কিছুক্ষণ রাখিলে দেখিবে, মাঝখানের যে অংশটি কাল কাগজে ঢাকা ছিল তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে কিন্তু বাকি অংশ নীলবর্ণ হইয়াছে। কারণ, আয়োডিনের সহিত শ্বেতসারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইলে নীলবর্ণ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলে সূর্যালোক ব্যতীত পাতায় শ্বেতসার প্রস্তুত হয় না।



৩৮নং চিত্র—সালোকসংশ্লেষে আলোকের প্রভাব—(ক) পাতার মধ্যস্থল কাল কাগজে ঢাকা; (খ) কাল কাগজ খুলিয়া কিছুক্ষণ আয়োডিনেয় দ্রবণে রাখিবার পর

প্রশ্ন

১। শক্তি কি? ইহা কয় প্রকার এবং কি কি? সৌরশক্তিই যে সকল শক্তির মূল তাহা প্রমাণ কর। ২। তাপ কি? তাপের উৎস সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৩। তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের কি কি পরিবর্তন হয় তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। ৪। তাপমান যন্ত্র কাহাকে বলে? কিরূপে তাপমান যন্ত্র তৈয়ারী করা যায়? ফারেণহাইট ও সেন্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? ৫। তাপের পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের তুলনা কর। ৬। সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে? সূর্যকিরণ ব্যতীত যে উদ্ভিদ্ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবের কথা (Living objects)

তোমরা চারিদিকে তাকাইলে দুই প্রকার বস্তু দেখিতে পাইবে—সজীব (living) ও নির্জীব বা জড় (non-living) পদার্থ। যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা সজীব বা চেতন পদার্থ এবং যাহাদের প্রাণ নাই তাহারা নির্জীব বা জড় বা অচেতন পদার্থ। প্রাণ কি, তাহা সঠিক-ভাবে ধারণা বা ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেও জীবের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার সাহায্যে উহাদিগকে জড় পদার্থ হইতে সহজেই পৃথক্ করিতে পারা যায়। এই সকল লক্ষণ গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা জীব। কিন্তু জল, বায়ু, মাটি, পাথর প্রভৃতিতে এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া উহারা জড় পদার্থ।

জীব ও জড়ের পার্থক্য (Distinction between the living and non-living)

যে সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জীবকে জড় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় তাহা নীচে বলা হইল :—

(১) প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm)—জীব-দেহ এক বা একাধিক কোষ (cell) দিয়া গঠিত। কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম নামক জেলির মত স্বচ্ছ পদার্থ থাকে। প্রোটোপ্লাজ্‌মই প্রাণশক্তির উৎস ও আধার ; ইহার অভাবে কোষ মরিয়া যায়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের সর্বাপেক্ষা ঘন অংশটিকে **নিউক্লিয়স** (nucleus) বলে। নিউক্লিয়স প্রোটোপ্লাজ্‌মকে শাসনে রাখে।

জড় পদার্থের প্রোটোপ্লাজ্‌ম বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

(২) আহার, পুষ্টি ও বৃদ্ধি (Nutrition and growth)—জীব মাত্রেরই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই খাদ্য গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন হয় এবং ক্রমে জীব বড় হইতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে জীবের পুষ্টিসাধন হয় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।

জড়ের আহার বলিয়া কিছু নাই এবং সাধারণতঃ উহাদের বৃদ্ধিও নাই। কোন কোন জড় পদার্থ বড় হয় বটে কিন্তু এই রকম বড় হওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তোমরা যদি একটি মিছরির টুকরাকে সূতা দিয়া ঘন মিছরির সরবতের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখ তাহা হইলে দেখিবে ইহা ক্রমশঃ বড় হইতেছে। মনে রাখিও, জীব খাদ্য হজম করিয়া দেহসাৎ করে ও পরে ভিতর হইতে বড় হয়, কিন্তু জড় পদার্থ কোন জিনিস দেহসাৎ করিতে পারে না, উহা বাহির হইতে বড় হয়।

(৩) চলাফেরা (Locomotion)—অধিকাংশ জীবের চলাফেরা করিবার ক্ষমতা আছে। প্রাণীদিগের মধ্যে এই লক্ষণটি বিশেষভাবে দেখা যায়। তাহারা ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অপর স্থানে সহজে যাইতে পারে। সাধারণতঃ উদ্ভিদের এই প্রকার চলচ্ছক্তি না থাকিলেও উহাদের অংগ-প্রত্যংগ একেবারে স্থির নহে। কাণ্ড আলো পাইবার জন্য মাটির উপরে উঠে এবং মূল খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মাটির ভিতরে বিভিন্ন দিকে যায়।

জড় পদার্থের চলাফেরা করিবার কোনও ক্ষমতা নাই।

(৪) শ্বাসকার্য (Respiration)—সকল জীব শ্বাসকার্য করে অর্থাৎ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এই কার্যের সময় জীবদেহে এক প্রকার মৃদু দহন ক্রিয়া হয় যাহার ফলে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই শক্তিই

জীবের দেহের তাপ রক্ষা করে এবং ইহার সাহায্যে জীব সকল কাজ করিতে সমর্থ হয়। শ্বাসকার্য জীবদেহে দিবারাত্র চলিতেছে। ইহা জীবের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে উহা বন্ধ হইলে জীব মরিয়া যায়।

জড় পদার্থ শ্বাসকার্য করিতে পারে না।

(৫) **উদ্দীপনা-শক্তি বা উত্তেজিত্ব** (Response to stimulus)—জীব বাহিরের আঘাতে বা উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ লজ্জাবতী গাছের পাতা বা ডাল স্পর্শ করিলেই পাতা মুদিয়া যায়। একটা কেন্নো স্পর্শ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। এইরূপ আচরণকে উদ্দীপনা-শক্তি বা সাড়া দেওয়া বলে।

জড় পদার্থের কোন উদ্দীপনা-শক্তি নাই।

(৬) **বংশবৃদ্ধি** (Reproduction)—সকল জীব জাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে, নতুবা পৃথিবী হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইত। প্রাণী সন্তানের জন্ম দিয়া এবং উদ্ভিদ্ বীজ উৎপন্ন করিয়া বংশবৃদ্ধি করে।

জড় পদার্থের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নাই।

(৭) **জন্ম ও মৃত্যু** (Birth and death)—সকল জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে। মৃত্যু জীবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। জীব মরিয়া গেলে জড় পদার্থে পরিণত হয়।

জড় পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পার্থক্য (Difference between plants and animals)

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে যে সকল পার্থক্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত হইল :—

উদ্ভিদের কোষের চারিদিকে একটি প্রাচীর বা আবরণ আছে, ইহাকে কোষ-প্রাচীর (cell-wall) বলে। প্রাণীর কোষের কোন প্রাচীর নাই।

উদ্ভিদের দেহে কোন সামঞ্জস্য (symmetry) নাই, অর্থাৎ উহাকে লম্বালম্বি কাটিলে খণ্ডিত অংশ দুইটি এক রকমের হয় না, কিন্তু প্রাণীর দেহে সামঞ্জস্য আছে।

প্রাণীর চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্র আছে কিন্তু উদ্ভিদের এইরূপ কোন যন্ত্র নাই।

উদ্ভিদের দেহে, বিশেষতঃ পাতায়, সবুজ রঙ (chlorophyll) আছে ; এইজন্য ইহাদিগকে সবুজ দেখায়। প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ এই সবুজ রঙ নাই।

উদ্ভিদ্ মাটি ও বায়ু হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া সবুজ রঙ ও সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রাণী এই প্রকারে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। খাদ্যের জন্য প্রাণীকে উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য প্রাণী উদ্ভিদ্ খায় অথবা যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ্ খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদিগকে খায়।

উদ্ভিদ্ কেবলমাত্র তরল খাদ্য খাইতে পারে, কিন্তু প্রাণী তরল ও কঠিন উভয় প্রকার খাদ্য খায়।

অধিকাংশ উদ্ভিদ্ চলাফেরা করিতে পারে না, কারণ উহারা শিকড়ের সাহায্যে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণী ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে যাইতে পারে।

প্রাণী সাধারণতঃ ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য করে ; কিন্তু উদ্ভিদের শ্বাসকার্য করিবার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্র নাই, সমস্ত দেহ দিয়াই ইহাদের শ্বাসকার্য হইয়া থাকে।

জীবদেহে পুষ্টিসাধনের সময় নানা প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। প্রাণী এই সকল পদার্থ মলমূত্র ও ঘর্মরূপে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু উদ্ভিদ্ এই সকল দূষিত পদার্থ দেহের কোন স্থানে জমা করিয়া রাখে অথবা সময় সময় দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়।

প্রাণীর দেহে সকল অংশই এক সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু উদ্ভিদের কাণ্ডের ও মূলের আগাই সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

প্রাণী সন্তান উৎপাদন করিয়া বংশবৃদ্ধি করে ; কিন্তু উদ্ভিদ্ বীজ উৎপন্ন করিয়া অথবা দেহের কোন অংশ পৃথক্ করিয়া বংশবৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of plants)

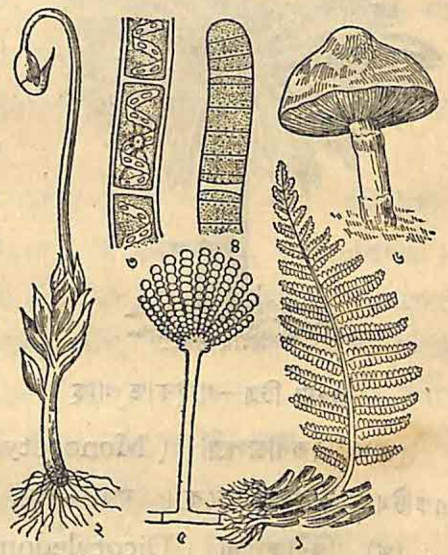
পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ্ আছে। সকলের আকার আবার এক রকমের নয়। তোমরা মনে কর, উদ্ভিদ্ মাত্রেরই মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থাকিবেই। কিন্তু এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের এই সকল বিভিন্ন অঙ্গ নাই। এমনকি অনেকের ফুল ও ফল হয় না ; সুতরাং বীজও নাই। এই সকল উদ্ভিদ্ অন্য প্রকারে বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। উদ্ভিদের সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিতে হইলে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন।

উদ্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—**অবীজ** (seedless plants) ও **সবীজ** (seed-bearing plants or spermatophytes)। যে সকল গাছের বীজ হয় না তাহাদিগকে অবীজ উদ্ভিদ্ এবং যাহাদের বীজ হয় তাহাদিগকে সবীজ উদ্ভিদ্ বলে। মনে রাখিও, সবীজ গাছ সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ্।

অবীজ উদ্ভিদ্‌কে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :

(১) **সমাংগদেহী উদ্ভিদ্** (Thallophyta)—এই প্রকার উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা ও মূল নাই। ইহাদের দেহ এক বা একাধিক

কোষে গঠিত। মনে রাখিও, ইহারাই সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্। ইহাদের আবার দুইটি ভাগ আছে—(ক) **শৈবাল** (Algae)—ইহাদের দেহে সবুজ কণিকা (chloroplasts) থাকে বলিয়া সবুজ রঙের হয়, যেমন—শেওলা। পুকুর, বিল প্রভৃতি জলাশয়ে প্রচুর শেওলা দেখা যায়। (খ) ছত্রাক (Fungi)— ইহাদের দেহ কখনও সবুজ রঙের হয় না, যেমন—ব্যাঙের ছাতা ও নানাপ্রকার ছাতা। ব্যাঙের ছাতা বর্ষাকালে সাধারণতঃ পচা কাঠ ও বাঁশের উপর জন্মায়। (২) **মস্‌জাতীয় উদ্ভিদ্** (Bryophyta) —এই প্রকার উদ্ভিদের সাধারণতঃ কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নাই, যেমন—মস্ (Moss)। তোমরা বর্ষাকালে দেওয়ালে বা ছাদের উপর যে সবুজ আস্তরণ দেখিতে পাও, তাহা এই প্রকার উদ্ভিদ্। (৩) ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদ্ (Pteridophyta)—এই প্রকার উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে, যেমন—ফার্ণ (Fern) বা ঢেঁকিশাক, শুশ্‌নি শাক প্রভৃতি। ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের সবীজ উদ্ভিদের মত মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে ; কিন্তু ইহারা বীজ উৎপন্ন করে না।



৩৯নং চিত্র— বিভিন্ন প্রকার অবীজ উদ্ভিদ্
(১) ফার্ণ, (২) মস্, (৩, ৪) শৈবাল, (৫, ৬) ছত্রাক

সবীজ উদ্ভিদ্‌কে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ—(১) নগ্নবীজ (Gymnosperms)—এই প্রকার উদ্ভিদের ফল হয় না, সুতরাং বীজ অনাবৃত বা নগ্ন থাকে, যেমন—সরল গাছ (Pine), সাইকাড্ (Cycad) প্রভৃতি। (২) আবৃতবীজ (Angiosperms)—এই প্রকার উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে অর্থাৎ বীজ আবৃত থাকে। আবৃত বীজ উদ্ভিদ্‌কে ইহাদের বীজপত্রের সংখ্যা অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ—



৪০নং চিত্র—সাইকাড্ গাছ

(ক) একবীজপত্রী (Monocotyledons)—ইহাদের বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে। যথা—ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি।

(খ) দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledons)—ইহাদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে। যথা—ছোলা, মটর, তেঁতুল, আম প্রভৃতি।

নিম্নে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের একটি ছক দেওয়া হইল—

- উদ্ভিদ্
  - অবীজ
    - ফার্ণজাতীয়
    - মস্‌জাতীয়
    - সমাংগদেহী
      - শৈবাল
      - ছত্রাক
  - সবীজ
    - আবৃতবীজ
      - একবীজপত্রী
      - দ্বিবীজপত্রী
    - নগ্নবীজ

প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of animals)

পৃথিবীর সকল স্থানে অসংখ্য প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা জলে, কেহ বা স্থলে বিচরণ করে, আবার কেহ বা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। লক্ষ্য করিবে, প্রাণীর আকার ও প্রকার বিভিন্ন। কতকগুলি প্রাণী এত ছোট যে উহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায় না। উহাদিগকে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope) আবশ্যক। মনে রাখিও, দৃশ্যমান প্রাণী অপেক্ষা অদৃশ্যমান প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশী।

সমস্ত প্রাণীকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—**অমেরুদণ্ডী** (Invertebrate) ও **মেরুদণ্ডী** (Vertebrate)। যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নাই তাহাদিগকে অমেরুদণ্ডী বলে, যেমন—পিপীলিকা, মশা, মাছি, কেঁচো, তারা মাছ, চিংড়ি, শামুক, কাঁকড়া প্রভৃতি (৪১নং চিত্র)। যাহাদের মেরুদণ্ড আছে তাহাদিগকে মেরুদণ্ডী বলে, যেমন—মাছ, কুমীর, সাপ, ব্যাঙ, পাখী, কুকুর, গরু, মানুষ প্রভৃতি (৪২নং চিত্র)।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে নয়টি পর্বে ভাগ করা হইয়াছে—

(১) **আদ্যপ্রাণী** (Protozoa)—ইহাদের দেহ একটি কোষে গঠিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের দেখা যায় না। ইহারা সাধারণতঃ জলে থাকে, তবে আমাদের দেহের মধ্যেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যামিবা ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রভৃতি এই প্রকার প্রাণী।

(২) **ছিদ্রাল প্রাণী** (Porifera)—ইহাদের দেহ দুই স্তরযুক্ত কোষের দ্বারা গঠিত, যেমন—স্পঞ্জ। ইহারা সমুদ্রে বাস করে কিন্তু চলাফেরা করিতে পারে না। ইহারা অনেক সময় সবুজ রঙের হয় এবং দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে।

(৩) একনালী দেহী (Coelenterata)—ইহাদের দেহ ছিদ্রাল প্রাণীর মত দুই স্তরযুক্ত কোষের দ্বারা গঠিত, কিন্তু দেহের মধ্যে একটিমাত্র নালী থাকে। এই নালীর একটিমাত্র মুখ আছে। প্রবাল, জেলিফিস, হাইড্রা প্রভৃতি এইপ্রকার প্রাণী।

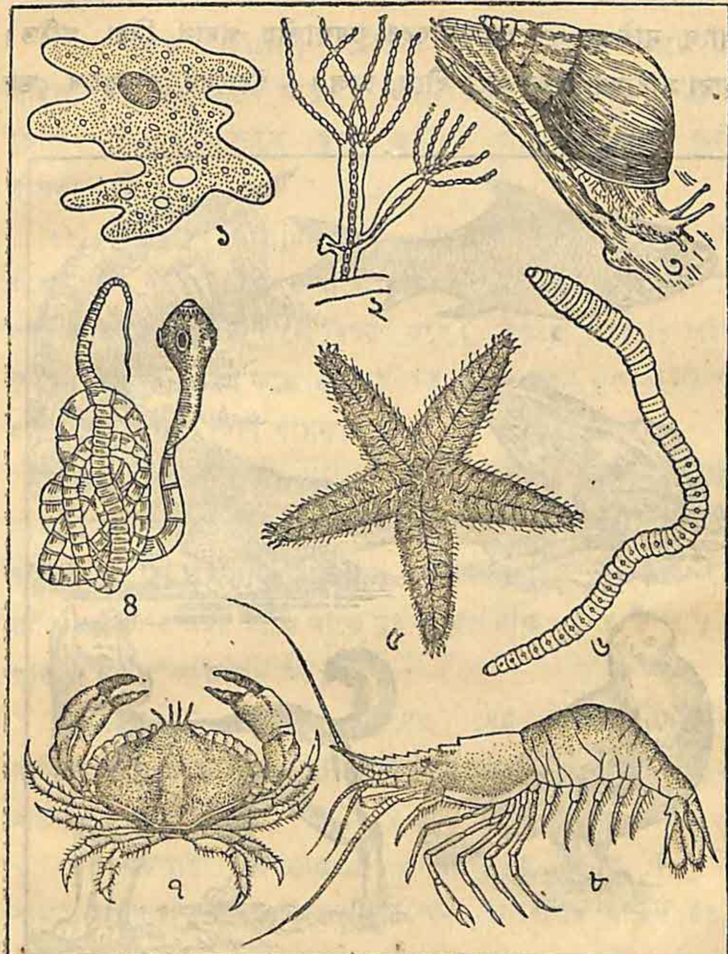
(৪) চ্যাপ্‌টা কৃমি (Platyhelminthes)—ইহাদের দেহ ফিতার মত চ্যাপ্‌টা, যেমন—যকৃৎ কৃমি, ফিতা কৃমি প্রভৃতি। যকৃৎ কৃমি প্রধানতঃ ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর যকৃতে ও পিত্তাশয়ে (gall-bladder) বাস করে এবং ফিতা কৃমি আমাদের অন্ত্রের মধ্যে বাস করে। ইহাদের অধিকাংশই উভলিংগ।

(৫) গোল কৃমি (Nemathelminthes)—ইহারা সূতার মত লম্বা হয় এবং দেহের আবরণ স্বচ্ছ ও পুরু। ইহারা সাধারণতঃ প্রাণীর বৃহদন্ত্রের মধ্যে বাস করে। অধিকাংশের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

(৬) অঙ্গুরীমাল (Annelida)—ইহাদের সম্পূর্ণ দেহটি নলের মত লম্বা হয় এবং এক সার পরস্পর সংযুক্ত আংটির মত খণ্ড দিয়া গঠিত। দেহের আবরণ স্বচ্ছ। ইহারা উভলিংগ। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী।

(৭) কণ্টকত্বক (Echinodermata)—ইহাদের ত্বক কাঁটায় আবৃত। ইহারা সমুদ্রে বাস করে কিন্তু তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। তারা মাছ, সমুদ্র শসা প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী।

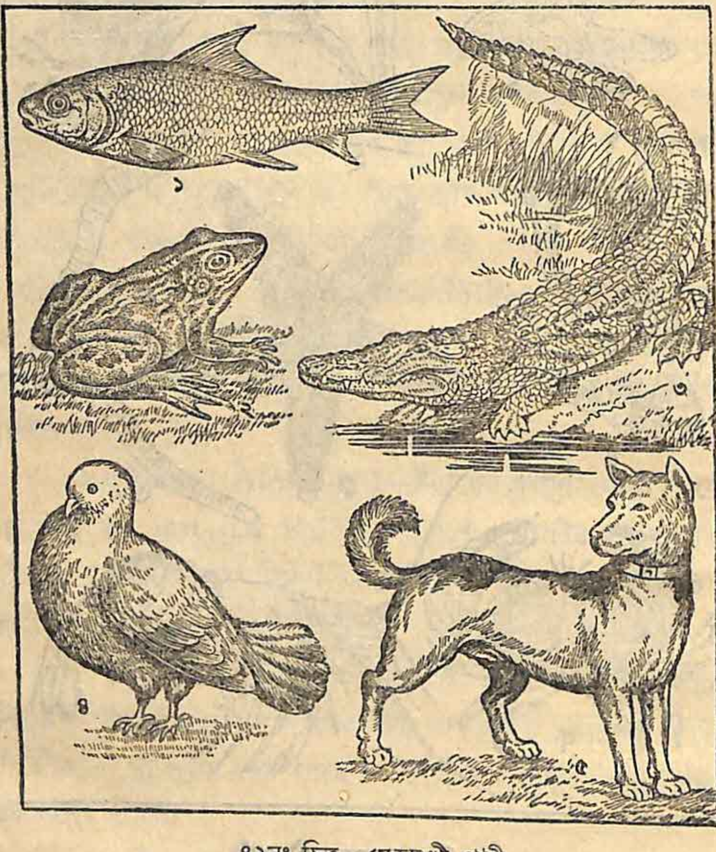
(৮) সন্ধিপদ (Arthropoda)—ইহাদের দেহ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। সাধারণতঃ প্রত্যেক খণ্ডের উপাংগ (appendage) সন্ধিযুক্ত থাকে। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। পতংগ, কেন্নো, বিছা, মাকড়সা, চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী।



৪১নং চিত্র—অমেরুদণ্ডী প্রাণী

(১) অ্যামিবা, (২) হাইড্রা, (৩) শামুক, (৪) ফিতা কৃমি, (৫) তারা মাছ, (৬) কেঁচো, (৭) কাঁকড়া, (৮) চিংড়ি

(৯) **শম্বুক** (Mollusca)—ইহাদের দেহে কোন খণ্ড বা উপাংগ নাই। দেহের আবরণ চুনজাতীয় পদার্থ দিয়া গঠিত। ইহারা সাধারণতঃ খুব ধীরে ধীরে চলে। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ



৪২নং চিত্র—মেরুদণ্ডী প্রাণী

(১) মাছ, (২) ব্যাঙ, (৩) কুমীর, (৪) পায়রা, (৫) কুকুর

আছে ; কতকগুলি উভলিংগও হয়। শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ, অক্টোপাশ প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে ঃ—

(১) **মৎস্য** (Fish)—ইহাদের জোড়া পাখ্‌না আছে এবং অধিকাংশের দেহ আঁশে আবৃত। ইহারা জলে বাস করে। এইজন্য ইহারা ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য করে।

(২) **উভচর** (Amphibia)—যথা, ব্যাঙ। ইহাদের দেহে আঁশ নাই। ইহারা শৈশব বা ব্যাঙাচি অবস্থায় জলে বাস করে কিন্তু পরিণত বয়সে জলে ও স্থলে বিচরণ করে। ইহারা ব্যাঙাচি অবস্থায় ফুলকা দিয়া শ্বাসকার্য করে এবং পরিণত বয়সে যখন ফুলকা নষ্ট হইয়া যায় তখন ফুসফুস দিয়া শ্বাসকার্য করে।

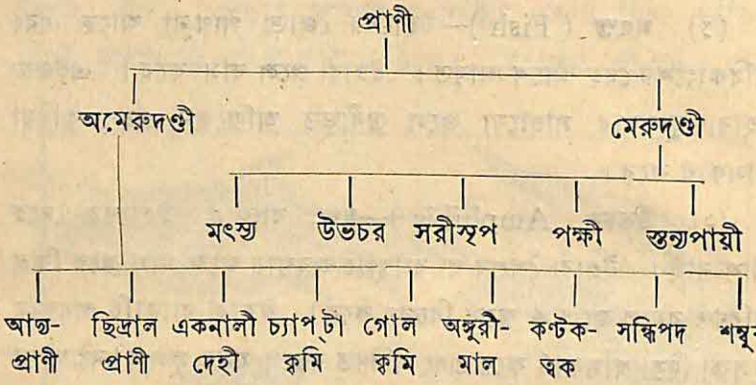
(৩) **সরীসৃপ** (Reptile)—যথা, কুমীর, কচ্ছপ, টিক্‌টিকি, সাপ প্রভৃতি। ইহাদের দেহ আঁশে আবৃত। ইহারা বুকে ভর দিয়া চলে। ইহারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে। এইজন্য ইহারা জলে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে মুখ-সমেত নাক জলের উপর তুলিয়া বাতাস হইতে অক্সিজেন লয়।

(৪) **পক্ষী** (Bird)—ইহাদের দেহ পালকে আবৃত। অধিকাংশ পাখী ডানার সাহায্যে উড়িতে পারে। ইহাদের ফুসফুস আছে।

(৫) **স্তন্যপায়ী** (Mammal)—যথা, কুকুর, বিড়াল, গরু, সিংহ, বানর, মানুষ প্রভৃতি। ইহারা সর্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রাণী। ইহাদের দেহ ছোট-বড় লোমে আবৃত। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী, একেবারে সন্তান প্রসব করে। সন্তান শৈশবকালে মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবনধারণ করে।

মনে রাখিও, মৎস্য, উভচর ও সরীসৃপের রক্ত ঠাণ্ডা কিন্তু পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর রক্ত গরম।

নীচে প্রাণীর শ্রেণীবিভাগের একটি ছক দেওয়া হইল—



মটর গাছের বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ (Observation of the different parts of Pea plant)

মটর শিমজাতীয় গাছ। ইহা বর্ষজীবী। ধান হইতে আমরা যেমন চাউল পাই, মটর হইতে আমরা এক প্রকার ডাল পাই। আমাদের দেশে কাতিক-অগ্রহায়ণ মাসে মটর বীজ বোনা হয়, চৈত্র মাসে ফসল কাটা হয়।

মূল (Root)—একটি মটর গাছ সাবধানে উপড়াইয়া পরীক্ষা কর। লক্ষ্য কর, ইহার একটি লম্বা শিকড় আছে, ইহাকে **প্রধান মূল** (tap root) বলে। প্রধান মূলের গা হইতে কতকগুলি ছোট ছোট শিকড় বাহির হইয়াছে; ইহাদিগকে **শাখামূল** (branch root) বলে। আরও লক্ষ্য কর, প্রধান মূলের ও শাখামূলের আগায় একটি টুপির মত ঢাক্‌নি আছে; ইহাকে **মূলত্রাণ** বা **মূলত্র** (root-cap) বলে। মূলত্র মূলের আগাকে রক্ষা করে। মূলত্রের উপরেই খানিকটা জায়গায় খুব ছোট ছোট রোম আছে; ইহাদিগকে **মূল-রোম** (root-hairs) বলে।

প্রধান মূল ও শাখামূলগুলি মটর গাছকে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে। মটর গাছ মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস শোষণ করে। গাছেরা সাধারণতঃ মাটি হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। কিন্তু মটর গাছের মূলের একটা বিশেষত্ব আছে। ইহা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। মটর গাছের মূল একপ্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহার ফলে, মূলে গুটি (nodules) জন্মে। এই গুটির মধ্যে জীবাণু বাস করে। এই জীবাণুগুলি মাটির বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং পরে নাইট্রেটে পরিণত করিয়া মটর গাছকে দেয়। মটর গাছও ইহার পরিবর্তে উহাদিগকে শর্করাজাতীয় খাদ্য দেয়, কারণ সবুজ রঙ না থাকায় উহারা এইপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। এইরূপে মটর গাছ ও জীবাণুগুলি পরস্পরের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে।



৪৩নং চিত্র—মটর গাছ

কাণ্ড (Stem)—মটর গাছের কাণ্ড দুর্বল, নরম ও ফাঁপা এবং দেখিতে সবুজ রঙের। ইহা দুর্বল বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কাণ্ডের যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয়, তাহাকে পর্বসন্ধি বা গাঁট (node) বলে। দুইটি পর্বসন্ধির মাঝখানের

অংশকে **পর্ব** বা **পাব** (internode) বলে। লক্ষ্য কর, মটর গাছের কাণ্ডের আগার দিকে পর্বগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে। পাতা ও পর্বসন্ধির সংযোগস্থলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে **কক্ষ** (axil) বলে। প্রত্যেক কক্ষে একটি করিয়া মুকুল থাকে ; ইহাকে **কক্ষমুকুল** (axillary bud) বলে। কাণ্ডের ও শাখা-প্রশাখার আগাতেও মুকুল থাকে। ইহাদিগকে **অগ্রমুকুল** (terminal bud) বলে। কক্ষমুকুল হইতে শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয় এবং অগ্রমুকুলের সাহায্যে গাছ ক্রমশঃ লম্বা হয়।

কাণ্ড দুইটি কাজ করে—(১) ইহা পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। (২) ইহা মূল-রোম দিয়া শোষিত রসকে পাতায় চালনা করে এবং পাতায় প্রস্তুত খাদ্যকে গাছের বিভিন্ন অংশে চালনা করে।

পাতা (Leaf)—মটর গাছের পাতা **যৌগিক** (compound) ও **পক্ষাকার** (pinnate), অর্থাৎ একটি সরু বোঁটার উপর কয়েক জোড়া ছোট ছোট ফলক (অনুফলক, leaflets) পাখীর পালকের মত সাজান থাকে। লক্ষ্য কর, আগার কয়েকটি অনুফলক আকর্ষতে (tendril) পরিণত হইয়াছে। এই আকর্ষ কোনও অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরিয়া মটর গাছকে খাড়া হইয়া থাকিতে সাহায্য করে। আরও লক্ষ্য কর, প্রত্যেক যৌগিক পাতার গোড়ায় বড় পাতার মত দুইটি **উপপত্র** (stipules) আছে।

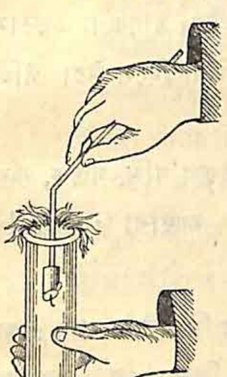
পাতা তিনটি কাজ করে—(১) **সালোকসংশ্লেষ** (Photo-synthesis) অর্থাৎ পাতার সবুজ কণা ও সূর্যকিরণের সাহায্যে মাটি হইতে শোষিত রস ও বায়ু হইতে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া শর্করা প্রস্তুত হয় ও অক্সিজেন মুক্ত হইয়া বায়ুতে মিশে। (২) **শ্বাসকার্য** (Respiration) অর্থাৎ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড

চাপ যত বেশী হয় তত বেশী দ্রবীভূত হয়। বাজারে সোডা ওয়াটার (Soda water) বলিয়া যাহা বিক্রয় হয় তাহা অত্যধিক চাপে জলে দ্রবীভূত এই গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। (৪) ইহা নিজে জ্বলে না এবং কোন দাহ্য বস্তু ইহার মধ্যে জ্বলিতে পারে না, বরং সত্বর নিভিয়া যায় বলিয়া ইহা অগ্নি নির্বাপক (fire extinguisher) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (৫) ইহা অত্যধিক চাপে কোন পাত্রে আবদ্ধ রাখিয়া হঠাৎ বাহির হইতে দিলে প্রসারণের ফলে ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া কঠিন ও বরফের অপেক্ষা অনেক বেশী ঠাণ্ডা হয়। এই জমানো গ্যাসকে শুকনা বরফ (dry ice) বলে। (৬) ইহা পরিষ্কার চুনের জলকে ঘোলাটে করে।



২২নং চিত্র—
কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে জ্বলন্ত বাতি নিভিয়া গিয়াছে

(ঘ) **হাইড্রোজেনের ধর্ম**—(১) হাইড্রোজেন একটি স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক হালকা ; এইজন্য বেলুনে এই গ্যাস ভর্তি করিলে উহা আকাশে উঠিয়া যায়। (৩) ইহা নিজে জ্বলে, কিন্তু কোন পদার্থকে জ্বলিতে সাহায্য করে না। (৪) ইহা দহনকালে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। (৫) ইহার অক্সিজেনের প্রতি বিশেষ আসক্তি আছে। এইজন্য ইহা যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে অতি সহজে অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে।



২৩নং চিত্র—হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিতেছে

জলের দ্রাবক শক্তি (Solvent action of water)—

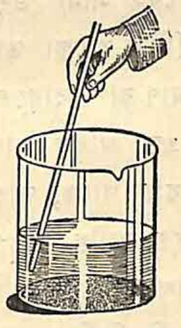
এক গেলাস জলে কিছু চিনি ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে চিনি গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। চিনি অদৃশ্য হইলেও প্রতি বিন্দু জলে যে চিনি মিশিয়া আছে, তাহা জলের মিষ্ট আস্বাদ হইতেই জানিতে পারা যায়। চিনির পরিবর্তে জলে লবণ ঢালিলে দেখিবে উহাও জলে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ঐ জলের স্বাদ লোণা। এই চিনি বা লবণ-গোলা জলকে যথাক্রমে চিনি ও লবণের **দ্রবণ** (solution) বলে। যে বস্তুগুলি জলে দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ গলিয়া যায় তাহাদিগকে **দ্রাব্য** (solute) বলে এবং ঐ জলকে **দ্রাবক** (solvent) বলে।

চিনি, মিছরি, লবণ, ফটকিরি, সোরা, তুঁতে প্রভৃতি বহু কঠিন পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়। জলে কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইলে দ্রবণের স্বাদ ও বর্ণ ঐ পদার্থের স্বাদ ও বর্ণ অনুযায়ী হইয়া থাকে। তোমরা জান তুঁতের রঙ নীল ; একটু তুঁতে জলে ফেলিয়া দিলে উহা গলিয়া যাইয়া জলের রঙ নীলবর্ণ হয়।

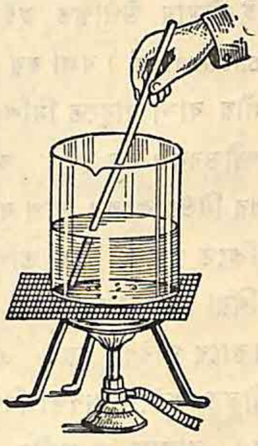
তোমরা জান বালি জলে গলে না। সেইরূপ খড়ি, গন্ধক, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ জলে গলে না। ইহাদিগকে **অদ্রাব্য** (insoluble) পদার্থ বলে।

এক সের জলে তুমি যত ইচ্ছা বালি মিশাইতে পার ; কারণ বালি জলে গলে না, মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু এক সের জলে তুমি ইচ্ছামত চিনি গলাইতে পার না। একটি পাত্রের জলের মধ্যে চিনি অল্প অল্প করিয়া ঢালিতে থাকিলে দেখিবে যে, প্রথমে চিনি খুব সহজেই গলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এমন একটা সময় আসিবে যখন চিনি আর গলিতেছে না, অতিরিক্ত চিনি পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়িয়াছে [২৪নং চিত্র]। তখন এই

দ্রবণকে **সংপৃক্ত বা পূর্ণসিক্ত দ্রবণ** (saturated solution) বলে। পাত্রে আরও খানিকটা জল ঢাল। দেখিবে, অতিরিক্ত চিনির খানিকটা বা সবটা গলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা জানিতে পারিলে যে, **নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত হয়**



২৪নং চিত্র—অতিরিক্ত চিনি পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়িতেছে



২৫নং চিত্র—উত্তাপে থিতান চিনি গলিয়া যাইতেছে

জল না ঢালিয়া যদি উপরোক্ত সংপৃক্ত দ্রবণ গরম কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, থিতান চিনি গলিয়া যাইবে (২৫নং চিত্র)। এখন পাত্রটি ঠাণ্ডা করিলে দেখিবে গরম অবস্থায় যে চিনি গলিয়া গিয়াছিল তাহা তলায় থিতাইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে **জলের দ্রাবক শক্তি উহার তাপ-মাত্রার উপর নির্ভর করে, তাপ বাড়িলে এই শক্তিও বাড়ে।**

বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টি (প্রকৃতিতে জলচক্র), মেঘ, কুয়াশা, শিশির ও তুষার (Humidity, Rain [or Water Cycle in Nature], Cloud, Fog, Dew and Snow)—

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প—সূর্যের তাপে সমুদ্র, হ্রদ, নদী, খাল,

বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল বাষ্পে পরিণত হইতেছে। তাহা হইলে আশা করা যায় অনন্ত পরিমাণ জলকণা বাষ্পে পরিণত হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। কেন-না, যে বায়ুর সঙ্গে উহা মিশিয়া যায় তাহারও বাষ্পধারণ করিবার একটা সীমা আছে; সেই সীমায় উপস্থিত হইলে বায়ুকে বাষ্পে **পূর্ণসিক্ত** বা **সংপৃক্ত** (saturated) বলা হয়। যতক্ষণ এই সীমা উত্তীর্ণ না হয় ততক্ষণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশিতে থাকে কিন্তু যেই সীমা উত্তীর্ণ হয়, বাষ্পীভবনও বন্ধ হয়। আবার, বায়ুর পূর্ণসিক্ত অবস্থা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। তাপ বাড়িলে বেশী পরিমাণ বাষ্প বায়ুতে মিশিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাপ কমিয়া গেলে এত অধিক বাষ্প আর মিশিয়া থাকিতে পারে না। অতিরিক্ত যাহা থাকে, তাহা তরল আকারে পরিণত হয়। এই প্রকারে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হইলে অবস্থা বিশেষে শিশির, কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা তোমরা সহজেই জানিতে পারিবে—



২৬নং চিত্র—গেলাসের বাহিরে জলবিন্দু

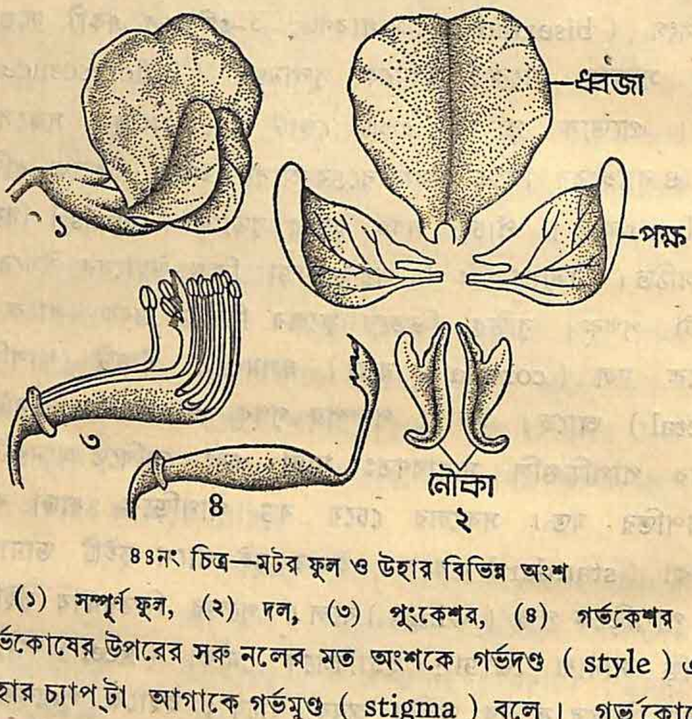
১৬নং পরীক্ষা—একটি গেলাসে বরফ ও জল রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, গেলাসের বাহিরের দিকে জলবিন্দু জমিয়াছে (২৬নং চিত্র)। ইহার কারণ এই যে, গরম বায়ু শীতল গেলাসের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাণ্ডা হয়। তখন ঐ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার শক্তি কমিয়া যায়। সেইজন্য কিছুটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হইল।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)—বায়ুতে সকল সময়ে জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুর আর্দ্রতা এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর

ও জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। (৩) প্রস্বেদন (Transpiration) অর্থাৎ মাটি হইতে শোষিত অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়।

ফুল (Flower)—মটর ফুল সম্পূর্ণ (complete) ও উভলিংগ (bisexual)। সাধারণতঃ ২-৩টি ফুল একটি দণ্ডের উপর সাজান থাকে; ইহাকে পুষ্পমঞ্জরী (inflorescence) বলে। প্রত্যেক ফুলের একটি ছোট বোঁটা আছে। সকলের নীচে ও বাহিরের দিকে সবুজ রঙের আবরণ আছে; ইহাকে বৃতি (calyx) বলে। পাঁচটি সবুজ রঙের বৃত্যংশ (sepals) দিয়া ইহা গঠিত। বৃত্যংশগুলি পরস্পর জোড়া কিন্তু উহাদের উপরের দিকটা পৃথক্। বৃতির ভিতরে ফুলের দ্বিতীয় স্তবক থাকে; ইহাকে দল (corolla) বলে। দলমণ্ডলে পাঁচটি পাপড়ি (petal) আছে। ইহারা পরস্পর পৃথক্ ও অসমান। মটর ফুলের পাপড়িগুলি সাধারণতঃ সাদা এবং দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির মত। সকলের চেয়ে বড় পাপড়িকে ধ্বজা বা পতাকা (standard) বলে। ইহার দুই পাশে দুইটি ডানার মত পাপড়িকে পক্ষ (wings) বলে। পক্ষের ভিতরকার দুইটি পাপড়ি সামান্য জোড়া; ইহাদিগকে নৌকা (keel) বলে। নৌকার ভিতরে ফুলের তৃতীয় স্তবক থাকে; ইহাকে পুংকেশর চক্র (androecium) বলে। ইহাতে দশটি পুংকেশর (stamens) আছে। ইহাদের মধ্যে নয়টির সূত্র (filament) মিলিত হইয়া একটি নলের মত হইয়াছে, দশমটি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই নল ফুলের চতুর্থ স্তবকের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখে। প্রত্যেক পুংকেশরের আগায় চ্যাপ্টা থলির মত অংশকে পরাগকোষ (anther) বলে। ইহার মধ্যে অসংখ্য হরিদ্রাবর্ণের পরাগ বা

রেণু (pollen grain) থাকে। ফুলের মাঝখানে চতুর্থ স্তবক আছে ; ইহাকে **গর্ভকেশর চক্র** (gynoecium) বলে । ইহা একটিমাত্র গর্ভকেশর (carpel) দিয়া গঠিত। ইহার নীচের দিকের লম্বা ও চ্যাপ্টা অংশকে গর্ভকোষ (ovary) বলে।



৪৪নং চিত্র—মটর ফুল ও উহার বিভিন্ন অংশ

(১) সম্পূর্ণ ফুল, (২) দল, (৩) পুংকেশর, (৪) গর্ভকেশর

গর্ভকোষের উপরের সরু নলের মত অংশকে গর্ভদণ্ড (style) এবং ইহার চ্যাপ্টা আগাকে গর্ভমুণ্ড (stigma) বলে। গর্ভকোষের ভিতরে একপাশে কতকগুলি ডিম্বক (ovule) থাকে এবং প্রত্যেক ডিম্বকের ভিতরে ডিম্বাই বা স্ত্রী জনন-কোষ (ovum or oosphere) আছে।

মটর ফুলের উপরোক্ত চারিটি স্তবক ফুলের বোঁটার আগায় বসান থাকে ; বোঁটার এই অংশটিকে পুষ্পাধার (thalamus) বলে।

ফুলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ করে। বৃতি কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের ভিতরকার অংশগুলিকে তাপ, শৈত্য ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। দলও বৃতির ন্যায় ফুলের ভিতরকার অংশগুলিকে রক্ষা করে এবং ইহার উজ্জ্বল রঙ বা গন্ধের সাহায্যে কীট-পতংগকে আকৃষ্ট করিয়া বীজ উৎপন্ন করিতে সাহায্য করে। পুংকেশর ও গর্ভকেশর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। ইহাদের ব্যতীত বীজ উৎপন্ন হয় না এবং বীজ না হইলে নূতন গাছও জন্মায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করাই ফুলের প্রধান কাজ।

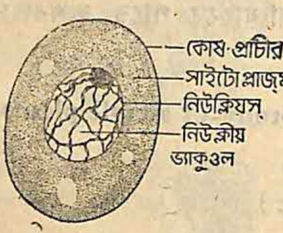
কয়েকটি সরল জীবের কথা (Study of simple plants and animals)

(১) ঈষ্ট্ (Yeast)

ঈষ্ট্ একপ্রকার ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ্। ইহার দেহ একটি কোষ দিয়া গঠিত। ইহাকে সাধারণতঃ ফুলের মধুগ্রন্থিতে ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা খেজুর রসে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, সকাল বেলায় খেজুর রস পান করিতে মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু বেলা ১১-১২টার সময় উহা গাঁজিয়া উঠে ও একটা বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, ঈষ্টের দেহ হইতে এক প্রকার জারক রস (enzyme) বাহির হইয়া খেজুর রসের শর্করাকে সুরাসারে (alcohol) পরিণত করে এবং এই সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় উহা বুদ্‌বুদ্ আকারে বাহির হইবার সময় ফেনা উৎপন্ন করে।

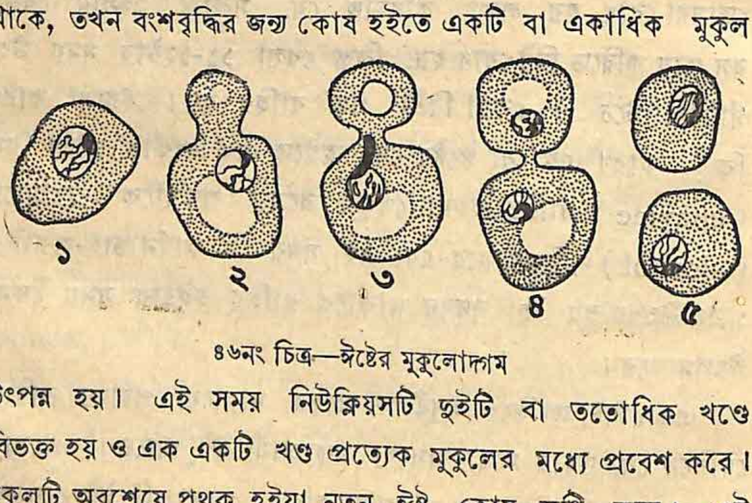
এক ফোঁটা তাড়িকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, উহার মধ্যে অসংখ্য এককোষী ঈষ্ট্ আছে। প্রত্যেক কোষের আকৃতি ডিম্বাকার বা গোলাকার। প্রত্যেকটি ঈষ্ট কোষের

বাহিরে কোষ-প্রাচীর আছে। ভিতরের জেলির মত স্বচ্ছ, নরম এবং আঠাল পদার্থকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) বলে। ইহার অপেক্ষাকৃত ঘন অংশটিকে নিউক্লিয়স (nucleus) বলে। নিউক্লিয়সের ভিতরের বড় ভ্যাকুওলটিকে নিউক্লিয়-ভ্যাকুওল (nuclear-vacuole) এবং নিউক্লিয়স বাদে প্রোটোপ্লাজ্‌মের বাকি অংশকে সাইটোপ্লাজ্‌ম বলে। লক্ষ্য করিবে, কোষের মধ্যে কোন সবুজ কণা নাই। এইজন্য ঈষ্ট্ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না, খেজুর রস প্রভৃতি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রোটিন ও তৈলজাতীয় পদার্থ প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে খাদ্যরূপে সঞ্চিত থাকে। কোষ-প্রাচীর (cell-wall) বেশ শক্ত ; ইহার রাসায়নিক প্রকৃতি অজ্ঞাত।



৪৫নং চিত্র—ঈষ্ট

অনুকূল অবস্থায় অর্থাৎ যখন প্রচুর পরিমাণে শর্করা বর্তমান থাকে, তখন বংশবৃদ্ধির জন্য কোষ হইতে একটি বা একাধিক মুকুল

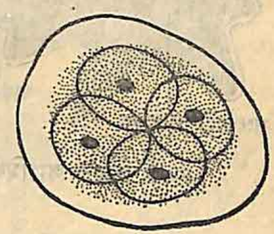


৪৬নং চিত্র—ঈষ্টের মুকুলোদ্গম

উৎপন্ন হয়। এই সময় নিউক্লিয়সটি দুইটি বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হয় ও এক একটি খণ্ড প্রত্যেক মুকুলের মধ্যে প্রবেশ করে। মুকুলটি অবশেষে পৃথক্ হইয়া নূতন ঈষ্ট্ কোষ সৃষ্টি করে। এই

প্রকার বংশবৃদ্ধিকে **মুকুলোদ্গম** (budding) বলে। মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়া এরূপ দ্রুত ঘটিয়া থাকে যে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য কোষ উৎপন্ন হয়।

প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ যখন শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন আর একপ্রকারে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সময় নিউক্লিয়সটি সাধারণতঃ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া চারিটি রেণু (spore) উৎপন্ন করে এবং পরে ইহাদের চারিদিকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম ঘনীভূত হইয়া ও কোষ-প্রাচীর গঠিত হইয়া চারিটি নূতন কোষ বা রেণু সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ঈষ্ট্ অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অনুকূল অবস্থা আসিলে মাতৃকোষটি ফাটিয়া গিয়া রেণুগুলি বাহির হইয়া পড়ে এবং মুকুলোদ্গম প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।



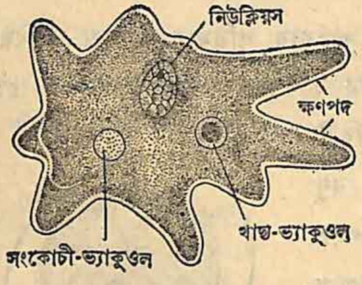
৪৭নং চিত্র—ঈষ্ট কোষের মধ্যে চারিটি রেণু

(২) অ্যামিবা (Amoeba)

অ্যামিবা একপ্রকার আদ্য প্রাণী। ইহার দেহও একটিমাত্র কোষ দিয়া গঠিত। ইহাকে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ্পূর্ণ পুকুর, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

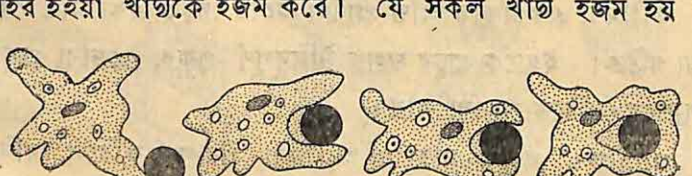
অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অ্যামিবা পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, ইহার দেহ অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন প্রোটোপ্লাজ্‌মে গঠিত। দেহের আকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। কারণ, সকল সময়ে দেহ হইতে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারের উপবৃদ্ধি বাহির হয় ও অদৃশ্য হয়। এই সকল উপবৃদ্ধিকে **ক্ষণপদ** (pseudopodia) বলে। অ্যামিবা ক্ষণপদের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে।

লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, দেহের মধ্যে নিউক্লিয়স, একটি বড় ভ্যাকুওল ও বালির কণার মত বহু ক্ষুদ্র বস্তু আছে। এই ভ্যাকুওলটি সর্বদা সংকুচিত হইয়া দেহের জলের পরিমাণ নির্ণয় করে ; এইজন্য ইহাকে সংকোচী-ভ্যাকুওল (contractile vacuole) বলে। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ভ্যাকুওলও আছে।



৪৮নং চিত্র—অ্যামিবা

অতি ক্ষুদ্র আয়তনের জলজ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী অ্যামিবার প্রধান খাদ্য। কোন খাদ্যদ্রব্য দেহের সংস্পর্শে আসিবামাত্র সেই স্থানের প্রোটোপ্লাজ্‌মের গতি রুদ্ধ হয়। তখন প্রোটোপ্লাজ্‌মের কিছু অংশ গড়াইয়া গিয়া খাদ্যটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে। খাদ্যের সহিত কিছু জল দেহের মধ্যে গৃহীত হইবার ফলে খাদ্য-ভ্যাকুওল (food vacuole) নামক ক্ষুদ্র ভ্যাকুওল সৃষ্ট হয়। এই খাদ্য-ভ্যাকুওলের মধ্যে জারক রস (enzyme) বাহির হইয়া খাদ্যকে হজম করে। যে সকল খাদ্য হজম হয় না

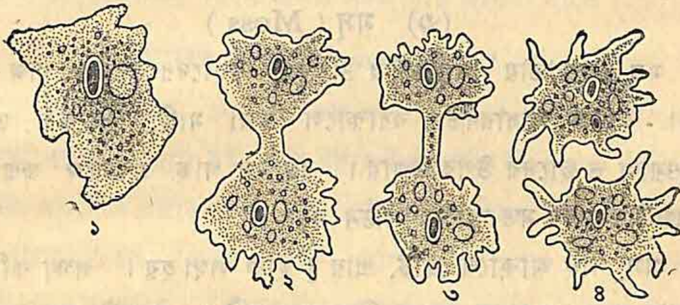


৪৯নং চিত্র—অ্যামিবা খাদ্য গ্রহণ করিতেছে

উহা বর্জদ্রব্য (waste products) রূপে ভ্যাকুওলের মধ্যে জমা থাকে। যখন খাদ্য-ভ্যাকুওলগুলি ফাটিয়া অদৃশ্য হয় তখন বর্জদ্রব্য দেহ হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। অ্যামিবা আগাইয়া যাইবার

সময় ঐগুলিকে পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অ্যামিবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই।

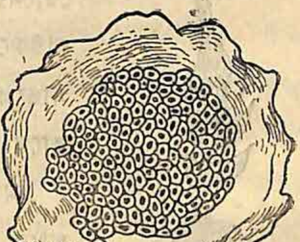
অনুকূল অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করিবার পূর্বে অ্যামিবা ক্ষণপদগুলি গুটাইয়া লয় এবং ইহার দেহ একটু লম্বাকৃতি হয়। পরে দেহের



৫০নং চিত্র—অনুকূল অবস্থায় অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি

মাঝখানের অংশ ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া দুইটি অংশে পৃথক্ হইয়া যায়। অবশ্য পৃথক্ হইবার পূর্বে নিউক্লিয়সটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি খণ্ড একটি অংশের মধ্যে থাকে। এইভাবে অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ অত্যধিক উত্তাপে বা যে জলে অ্যামিবা বাস করিতেছে তাহা শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইলে, অ্যামিবার অন্য প্রকারে বংশবৃদ্ধি হয়। এই সময় অ্যামিবা ক্ষণপদ-গুলি গুটাইয়া লইয়া গোলাকার হয় এবং দেহের চারিদিকে একটি আবরণ প্রস্তুত করে। পরে নিউক্লিয়সটি পুনঃপুনঃ বিভক্ত হইয়া



৫১নং চিত্র—প্রতিকূল অবস্থায় অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি

অনেকগুলি ছোট ছোট নিউক্লিয়স উৎপন্ন হয়। এইবার প্রোটোপ্লাজ্‌ম বহু খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতি খণ্ডে একটি করিয়া নিউক্লিয়স থাকে। অনুকূল অবস্থা আসিলে আবরণটি ফাটিয়া গিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিবা বাহির হইয়া আসে।

(৩) মস্ (Moss)

মস্ একজাতীয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্। ইহাদের কখনও বীজ হয় না। ইহারা সাধারণতঃ বর্ষাকালে ভিজা মাটি, গাছের ছাল, দেওয়াল ও ছাদের উপর জন্মায়। বহু মস্ গাছ একসঙ্গে জন্মাইয়া সবুজ মখমলের মত আস্তরণ গঠন করে।

মস্ গাছ আকারে ছোট, প্রায় ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। লক্ষ্য করিবে, ইহার কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু মূল নাই। কাণ্ডটি সরু তারের মত এবং ইহার উপরে অনেকগুলি সরু সরু পাতা সর্পিলভাবে (spirally) ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে। মূলের পরিবর্তে কাণ্ডের গোড়া হইতে অসংখ্য পিঙ্গলবর্ণের ছোট ছোট রোমের মত অংশ বাহির হয়; ইহাদিগকে রাইজয়েড (rhizoid) বলে। ইহারা মস্ গাছকে দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে আটকাইয়া রাখে ও উহা হইতে রস শোষণ করে।



৫২নং চিত্র—মস্ গাছ

মস্ গাছ কেবলমাত্র বর্ষাকালে বাঁচিয়া থাকে কিন্তু পরে মরিয়া যায়; সুতরাং এই সময়ের মধ্যে বংশরক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করে। লক্ষ্য করিবে, এই সময় কাণ্ডের আগা হইতে একটি বৃন্ত-যুক্ত থলি (capsule) উৎপন্ন হয়; থলির মাথা একটি টুপির মত

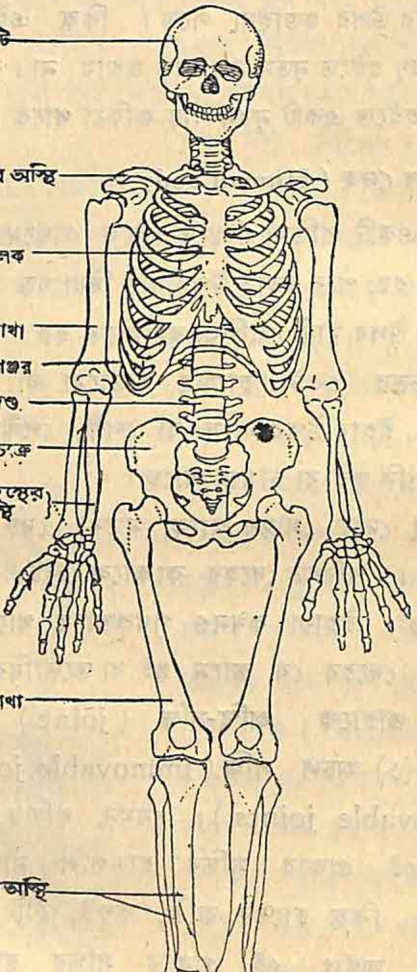
অংশ দিয়া ঢাকা থাকে। থলির মধ্যে অসংখ্য রেণু (spore) উৎপন্ন হয়। রেণুগুলি পরিপুষ্ট হইলে টুপি খসিয়া পড়ে এবং উহারা চারিদিকে মাটির উপর ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই সময় জলের অভাবের জন্য রেণু হইতে নূতন মস্ গাছ জন্মায় না। বর্ষাকাল আসিলে প্রত্যেক রেণু হইতে একটি নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে।

মানব দেহ (Human body)

তোমরা জান যে, একটি প্রতিমা গড়িতে হইলে প্রথমে বাঁশের কাঠামো প্রস্তুত করিতে হয়, পরে ইহার উপর দড়ি দিয়া খড় বাঁধিতে হয় এবং সর্বশেষে ইহার উপর মাটি লেপিয়া রঙ দিতে হয়। সেইরূপ আমাদের দেহের ভিতর একটা হাড়ের কাঠামো বা **কংকাল** (skeleton) আছে। ইহার উপর মাংস বা পেশী, পেশীর উপর মেদ বা চর্বি এবং সর্বোপরি ত্বক বা চামড়া আছে।

হাড় আছে বলিয়া দেহে সৌষ্ঠব আছে, নতুবা দেহ একটা মাংসপিণ্ডের মত হইত। পরিণত দেহের কংকালে ছোট-বড় মোট ২০৬ খানি হাড় আছে। ইহারা কখনও পৃথক্‌ভাবে থাকে না, একসঙ্গে গাঁথা থাকে। দেহের যে স্থানে দুই বা ততোধিক হাড় পরস্পর যুক্ত থাকে, তাহাকে **অস্থি-সন্ধি** (joint) বলে। অস্থি-সন্ধি দুই প্রকার—(১) **অচল সন্ধি** (immovable joints) ও (২) **সচল সন্ধি** (movable joints)। যেমন, খুলির অস্থি-সন্ধি অচল অর্থাৎ এই প্রকার সন্ধির হাড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় না। কিন্তু হাতের কব্জি, কনুই, হাঁটু প্রভৃতি সন্ধির হাড়গুলি সচল অর্থাৎ এই প্রকার সন্ধির হাড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়। সচল সন্ধি-স্থলে দুইখানি হাড় দুই দিক হইতে আসিয়া কব্জার মত মিলিত হয়। ইহাদের প্রান্তে তরুণাস্থি (cartilage) বা একপ্রকার নরম ও স্থিতিস্থাপক পদার্থের

আবরণ থাকে। তরুণাস্থির নীচে একটা পর্দা (synovial membrane) আছে। ইহা হইতে একপ্রকার তৈলের মত পিচ্ছিল পদার্থ বাহির হয়। এই তৈল থাকিবার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিবার সময় হাড়ের প্রান্ত ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সন্ধিস্থল বন্ধনী (ligament) বা একপ্রকার দড়ির মত পদার্থ দিয়া বাঁধা থাকে।



৫৩নং চিত্র—নর-কংকাল

হাড়ে কঠিন ও নরম দুই প্রকার অংশ আছে। হাড়ের উপরের অংশ কঠিন এবং উহার ভিতরের অংশ নরম। নরম অংশটি একপ্রকার লাল অথবা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের মাখনের মত পদার্থ দিয়া গঠিত; ইহাকে মজ্জা (marrow) বলে। হাড়ের উপরে একটি পাতলা পর্দা

(periosteum) আছে। এই পর্দার রক্তবহা নালী হাড়ের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া মজ্জার ভিতরে যায় ও উহার পুষ্টিসাধন করে।

দেহে প্রধানতঃ তিনটি অংশ আছে—(১) **মস্তক** (head), (২) **দেহকাণ্ড** বা **ধড়** (trunk) ও (৩) **প্রত্যংগ** বা **হস্তপদাদি অবয়ব** (upper and lower limbs)।

(১) **মস্তক**—ইহা **করোটি** বা **খুলি** (skull) ও **মুখমণ্ডল** লইয়া গঠিত। এই করোটি ৮ খানি চ্যাপ্‌টা হাড় দিয়া গঠিত একটি ফাঁপা বল বা বাক্স বিশেষ। ইহার মধ্যে **মস্তিষ্ক** (brain) বা মগজ থাকে। মস্তকের সামনে নীচের দিকের অংশকে মুখমণ্ডল (face) বলে। মুখমণ্ডলে ১৪ খানি হাড় আছে। ইহাদের মধ্যে ১৩ খানি খুলির সঙ্গে সংযুক্ত, কেবলমাত্র নীচের চোয়ালের হাড়খানি পৃথক্। এইজন্য নীচের চোয়ালখানি নাড়িতে পারা যায়। মুখমণ্ডলে **চক্ষু**, কর্ণ, ওষ্ঠ ও নিম্নলিখিত দুইটি গহ্বর বা বিবর আছে।

(ক) **নাসাপথ** (Nasal cavity)—ইহা একটি তিনকোণা গহ্বর বিশেষ। ইহার সামনে দুইটি ও পিছনে দুইটি গর্ত আছে। সামনের গর্ত দুইটিকে **নাসারন্ধ্র** (nostril) বলে। পিছনের গর্ত দুইটি **ফ্যারিংসের** (pharynx) বা **গলবিলের** উপরিভাগে অবস্থিত। নাসাপথটি একটি তরুণাস্থি দিয়া দুইভাগে বিভক্ত। নাসাপথের সামনের দিক লোমশ, বাকি অংশ অতি সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, শ্লেষ্মা-ঝিল্লী (mucous membrane) দিয়া আবৃত। বাতাস নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আঁকা-বাঁকা নাসাপথ দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই পথ দিয়া যাইবার সময় বাতাসের ধূলিকণা নাসাপথের লোমে ও শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর আঠাল পদার্থে আটকাইয়া যায়।

(খ) **মুখবিবর** (Buccal cavity)—দুইটি ঠোঁট এই বিবরের দরজা বিশেষ। মুখবিবরে দুই পাটি দাঁত আছে। পূর্ণবয়স্ক লোকের

প্রত্যেক পাটিতে ১৬টি করিয়া দাঁত থাকে। পাটির সামনে ৪টি **কৃন্তক দন্ত** (incisor) আছে। ইহাদের তুইপাশে তুইটি **ছেদক দন্ত** (canine) আছে। ছেদক দন্তের তুইপাশে তুইটি করিয়া মোট চারিটি **চর্বন দন্ত** (premolars) এবং সর্বশেষে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি **পেষক দন্ত** (molars) আছে। মুখবিবরের ভিতরের দিকের অংশকে **গলবিল** (pharynx) বলে। **জিভ** (tongue) গলবিলের সম্মুখ হইতে দাঁত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। জিভের নীচের দিক মসৃণ কিন্তু উপরের দিক এরূপ নহে ; ইহাতে বিন্দু বিন্দু উঁচু অংশ আছে। উঁচু অংশগুলিকে **স্বাদকোরক** (taste buds) বলে। ইহাদের সাহায্যেই আমরা কোন দ্রব্যের স্বাদ পাইয়া থাকি। গলবিল হইতে নীচের দিকে তুইটি নালী দেহকাণ্ডের ভিতরে পৃথক্‌ভাবে চলিয়া গিয়াছে। সামনের নালীকে **শ্বাসনালী** (trachea) ও পিছনের নালীকে **গ্রাসনালী** (oesophagus or gullet) বলে। নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনালী দিয়া বাতাস ফুসফুসে যায় এবং গ্রাসনালী দিয়া খাবার পাকস্থলীর ভিতরে যায়। মুখবিবরের উপরের কঠিন অংশকে **শক্ত তালু** (hard palate) ও ইহার পিছনের কোমল অংশকে **নরম তালু** (soft palate) বলে। নরম তালু ক্রমে **আলজিভে** (uvula) শেষ হইয়াছে। এই আলজিভ গলবিলকে নাসিকাপথ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। জিভের গোড়ায় শ্বাসনালীর উপরে **অধিজিহ্বা** (epiglottis) নামক একটি ঢাকনি আছে। খাইবার সময় আলজিভ নাসাপথের ছিদ্রকে ও অধিজিহ্বা শ্বাসনালীকে এরূপভাবে বন্ধ করিয়া রাখে যে, খাবার ঐ পথে যাইতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় তাড়াতাড়ি খাইবার ফলে খাদ্যের কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিয়া বিশেষ কষ্ট দেয়। ইহাকে “ **বিষমলাগা** ” বলে।

(২) **দেহকাণ্ড বা ধড়** (Trunk)—ইহার পাঁচটি অংশ আছে।

(ক) **মেরুদণ্ড** (Spine or Vertebral column)—ইহা পিছনের মস্তকের নীচ হইতে ধড়ের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা প্রায় ২৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩৩ খানি **কশেরুকা** (vertebra) বা গোলাকার হাড় দিয়া গঠিত। গ্রীবায় ৭ খানি, পৃষ্ঠে ১২ খানি ও কটিতে ৫ খানি কশেরুকা আছে। কটির নীচে **ত্রিকাস্থিতে** (sacrum) ৫ খানি কশেরুকা আছে, কিন্তু পরিণত বয়সে উহারা জুড়িয়া যায়। মেরুদণ্ডের শেষ অংশ **অনুত্রিকাস্থিতে** (coccyx) ৪টি কশেরুকা আছে এবং উহারাও পরে জুড়িয়া যায়। কশেরুকাগুলি মাংসপেশী ও বন্ধনী দিয়া খুব শক্ত করিয়া একত্র বাঁধা থাকে। এইজন্য মেরুদণ্ডটিকে এদিক-ওদিক ঘুরাইতে পারা যায়। পাছে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগিয়া মেরুদণ্ড বিকল হইয়া যায়, সেইজন্য দুইখানি কশেরুকার মাঝখানে তরুণাস্থি (cartilage) থাকে। লক্ষ্য করিবে, প্রত্যেক কশেরুকার মাঝখানে একটি বড় গর্ত আছে। কশেরুকাগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাহাতে সকল গর্ত মিলিত হইয়া একটি নালা গঠন করে। এই নালার ভিতরে **সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুরজ্জু** (spinal chord) থাকে।



৫৪নং চিত্র—মেরুদণ্ড
ক-খ—গ্রীবার কশেরুকা; খ-গ—পৃষ্ঠের কশেরুকা; গ-ঘ—কটির কশেরুকা ঘ-ঙ—ত্রিকাস্থি; ঙ-অনুত্রিকাস্থি;

(খ) **স্কন্ধ** (Shoulder)—পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুইটি তিনকোণা চ্যাপ্টা পাখনার মত হাড় আছে, তাহাকে

অংসফলক (scapula) বলে। ইহার সামনে দুই পাশে দুইখানি সরু ও বাঁকা হাড়কে **কণ্ঠাস্থি** (clavicle) বলে। এই হাড়গুলি লইয়া স্কন্ধদেশ গঠিত।

(গ) **বক্ষঃ** (Thorax)—বক্ষঃ নানাপ্রকার হাড় দিয়া এরূপভাবে গঠিত যে, উহাকে পাখীর পিঞ্জর বা খাঁচার মত দেখায়। ইহার সামনের দিকে লম্বা ও চ্যাপ্‌টা হাড়কে **উরঃফলক** (sternum) বলে। পিঞ্জরের পিছনের দিকে মেরুদণ্ডের ১২টি কশেরুকা আছে। প্রত্যেক কশেরুকার দুই পাশ হইতে দুইটি করিয়া মোট ২৪ খানি সরু ও বাঁকা হাড় বাহির হইয়াছে, ইহাদিগকে **পাঁজর** (rib) বলে। উপরের ৭ জোড়া পাঁজর উরঃফলকের সহিত সংযুক্ত এবং নীচের ৩ জোড়া পাঁজর তরুণাস্থির সাহায্যে উপরের পাঁজরের সঙ্গে সংযুক্ত। একাদশ ও দ্বাদশ জোড়া পাঁজর অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহারা উরঃফলকের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, খোলা থাকে। পাঁজরের হাড়গুলি মাংসপেশীর সাহায্যে বক্ষঃগহ্বর গঠন করে। এই গহ্বরের মধ্যে দুইধারে গোলাপী রঙের দুইটি **ফুসফুস** (lungs) আছে। ফুসফুস দুইটির মাঝখানে **হৃৎপিণ্ড** (heart) থাকে। ফুসফুস দিয়া শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ড দিয়া সমস্ত দেহে রক্ত সংবহিত হয়।

(ঘ) **উদর-গহ্বর** (Abdominal cavity)—ইহা দেহকাণ্ডের নীচের দিকে অবস্থিত। ইহা **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) নামক একটি মাংসপেশীর পর্দা দিয়া বক্ষঃগহ্বর হইতে পৃথক্ আছে। গ্রাসনালী মধ্যচ্ছদাকে ভেদ করিয়া **পাকস্থলীর** (stomach) সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পাকস্থলীর আকৃতি ভিস্তির মশকের মত। উদর-গহ্বরের ডান দিকে **যকৃৎ** (liver) থাকে। ইহার তিনটি খণ্ড আছে; মাঝখানের খণ্ডের সহিত **পিত্তাশয়** (gall bladder)

সংযুক্ত থাকে। পাকস্থলীর বাম দিকে **প্লীহা** (spleen) থাকে এবং উহার পিছন দিকে **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। উদর-গহ্বরের নীচের দিকে ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) থাকে ; ইহা পাকস্থলীর সহিত সংযুক্ত। ইহা প্রায় ২০ ফুট লম্বা একটি সরু নলের মত, কিন্তু কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। **বৃহদন্ত্র** (large intestine) ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত সংযুক্ত এবং উহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। উদর-গহ্বরের পিছনের দিকে ও মেরুদণ্ডের দুইপাশে **বৃক্ক** (kidney) অবস্থিত। বৃক্ক হইতে দুইটি নল বাহির হইতে মূত্রাশয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) **শ্রোণীচক্র** (Pelvis)—কোমরের দুইপাশে দুইখানি বড় অস্থি আছে ; ইহাদিগকে **নিতম্বাস্থি** (hip bones) বলে। শ্রোণীচক্রের পিছনে ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থি থাকে। ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া শ্রোণীচক্র বা বস্তি প্রদেশ গঠন করে। **মূত্রাশয়** (urinary bladder), **মলভাণ্ড** (rectum) প্রভৃতি এই অংশে অবস্থিত।

(৩) প্রত্যংগ (Limbs)—প্রত্যংগ বলিতে বাহু ও পদ বুঝায়। প্রত্যেক বাহুর তিনটি অংশ আছে—**প্রগণ্ড** (upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (fore arm) ও **হস্ত** (hand)। স্কন্ধ লইতে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে প্রগণ্ড বলে ; ইহা একটি লম্বা হাড় দিয়া গঠিত। কনুই হইতে কব্জি বা মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশকে প্রকোষ্ঠ বলে ; ইহা দুইটি হাড় দিয়া গঠিত। প্রত্যেক হাতে ২৭ খানি ছোট হাড় আছে। পদেরও তিনটি অংশ আছে—**উরু** (thigh), **জংঘা** (shank) ও **চরণ** (foot)। বস্তি হইতে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে উরু বলে ; ইহা একখানা লম্বা হাড় দিয়া গঠিত। হাঁটু হইতে পায়ের গাঁট পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে জংঘা বলে ; ইহা দুইটি হাড় দিয়া

গঠিত। হাঁটুর সামনে **মালাইচাকি** (patella) নামে একটি তিন-কোণা ছোট হাড় আছে। প্রত্যেক পায়ে ২৬ খানি ছোট হাড় আছে।

পাচন-তন্ত্র (Digestive system)

শরীর প্রতি মুহূর্তেই ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য খাইলেই শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় না, উহাকে পরিপাক করিবার শক্তি আবশ্যক। আমরা কোন খাদ্য খাইলে তাহা নানা অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অবশেষে উহার সার অংশ গৃহীত হইয়া দেহকে পুষ্ট করে এবং অসার অংশ মলরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

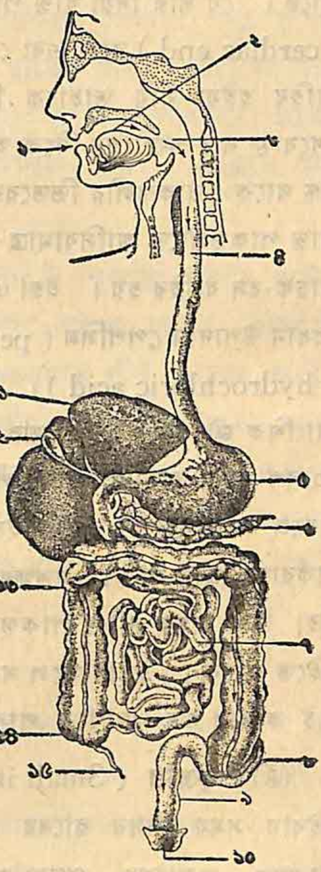
পরিপাক-যন্ত্রাবলী—যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে খাদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে পরিপাক-যন্ত্রাবলী বলে। পরিপাক-যন্ত্রটি একটি নল বিশেষ; ইহাকে **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal) বলে। এই নল প্রায় ৩০ ফুট লম্বা, তবে উহা কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে বলিয়া উদর-গহ্বরের অল্প স্থানই অধিকার করে। পৌষ্টিক নালীর পাঁচটি অংশ আছে—(১) মুখবিবর, (২) গ্রাসনালী বা অন্ননালী, (৩) পাকস্থলী, (৪) ক্ষুদ্রান্ত্র ও (৫) বৃহদন্ত্র। ইহা ব্যতীত দন্ত, জিহ্বা, লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

(১) **মুখবিবর** (Buccal cavity)—আমরা কোন কঠিন খাদ্য মুখের মধ্যে দিলে, ইহা দাঁতের সাহায্যে চর্বিত ও পিষ্ট হইয়া ডেলার মত হয়। এই সময় জিহ্বা বিভিন্ন দিকে নাড়াচড়া করিয়া খাদ্যকে চর্বন করিতে সাহায্য করে। আমাদের মুখের মধ্যে তিন জোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary glands) আছে। চর্বন করিবার সময় এই সকল লালাগ্রন্থি হইতে লালা বাহির হইয়া খাদ্যের সহিত মিশে। ইহার ফলে খাদ্য নরম ও পিচ্ছিল হয়।

এইজন্য আমরা সহজে খাদ্য গিলিতে পারি। লালাতে টায়ালিন (ptyalin) নামে একপ্রকার জারক রস (enzyme) থাকে। ইহা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যকে আংশিক জীর্ণ করে। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত হইলে আমরা উহাকে গিলিয়া ফেলি। মনে রাখিও, আমরা গিলিবার উপক্রম করিলেই অধিজিহ্বা শ্বাসনালীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, নতুবা খাদ্যের কণা ইহাদের মধ্যে যাইলে বিষম লাগে। খাদ্য গিলিবার পর উহা গ্রাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) **গ্রাসনালী** (Oesophagus)—ইহা কতকগুলি গোলাকার মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত। খাদ্য এই নালীতে প্রবেশ করিলেই ঐ মাংসপেশীগুলি সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের ফলে খাদ্য ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া পাকস্থলীর মধ্যে যায়।

(৩) **পাকস্থলী** (Stomach)—ইহা একটি মাংসনির্মিত



৫৫নং চিত্র—পরিপাক-যন্ত্রাবলী
১। মুখবিবর ২। জিহ্বা, ৩। গলবিল, ৪। গ্রাসনালী, ৫। পাকস্থলী, ৬। অগ্ন্যাশয়, ৭। ক্ষুদ্রান্ত্র, ৮। মলভাণ্ড, ৯। মলনালী, ১০। নলদ্বার, ১১। যকৃৎ, ১২। পিত্তাশয়, ১৩-১৪। বৃহদন্ত্র

থলির মত, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ফুট ও প্রস্থে ৪-৫ ইঞ্চি। ইহার দুইটি দ্বার আছে। যে দ্বার দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে আসে তাহাকে **আগম দ্বার** (cardiac end) বলে এবং যে দ্বার দিয়া খাদ্য পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া যায় তাহাকে **নিগম দ্বার** (pyloric end) বলে। শেষোক্ত দ্বার ক্ষুদ্রান্ত্রের দিকে অবস্থিত এবং সাধারণতঃ পেশীচক্র দিয়া বন্ধ থাকে। পাকস্থলীর ভিতরের আবরণের গায়ে অসংখ্য গ্রন্থি থাকে। খাদ্য পাকস্থলীতে আসিবামাত্র এই সকল গ্রন্থি হইতে একপ্রকার পাচক-রস বাহির হয়। ইহা একপ্রকার পাতলা অম্লরস এবং ইহার প্রধান উপাদান **পেপসিন** (pepsin) ও **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (hydrochloric acid)। ইহা প্রধানতঃ প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে আংশিক জীর্ণ করে। খাদ্যের সহিত যে সকল জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তাহারা পাকস্থলীর অম্লরসে বিনষ্ট হয় ; এইরূপে দেহ সহজে ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। ইহা ব্যতীত পাকস্থলীর একপ্রকার রস শর্করাকে জীর্ণ করে। যতক্ষণ খাদ্য পাকস্থলীর ভিতরে থাকে ততক্ষণ ইহা উক্ত রসের সহিত পাকস্থলীর প্রাচীরের পেশী দ্বারা আন্দোলিত হইতে থাকে। ইহার ফলে খাদ্য কাদার মত অর্ধ তরল হইয়া যায়। এই কাদার মত পদার্থকে **পাকমণ্ড** (chyme) বলে।

(৪) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine)—খাদ্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবার সময় নিগম দ্বারের পেশী মাঝে মাঝে খুলিয়া যায় এবং পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ **গ্রহণীতে** (duodenum) প্রবেশ করে। এই সময় যকৃৎ হইতে **পিত্তরস** (bile), অগ্ন্যাশয় হইতে **অগ্ন্যাশয়-রস** (pancreatic juice) এবং ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে **আন্ত্রিক রস** (succus entericus), এই তিন প্রকার পাচক-রস ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল রসের সাহায্যে খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়। পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলেই ইহার প্রাচীরের

পেশীগুলি বিভিন্নরূপে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। ইহার ফলে খাদ্য পাচক-রসের সহিত আন্দোলিত হইয়া সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরকার আবরণে অসংখ্য সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত **শোষকনালী** (villi) থাকে। খাদ্যের সারাংশ ইহাদের দ্বারা শোষিত হইয়া কতক জালক ও কতক শোষকনালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে রক্ত-প্রবাহের সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপে খাদ্য দেহসাৎ (assimilated) হয়।

(৫) **বৃহদন্ত্র** (Large intestine)—ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে অজীর্ণ এবং আংশিক জীর্ণ খাদ্য বৃহদন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এইস্থানে কোনরূপ পরিপাক ক্রিয়া হয় না। কেবলমাত্র জীর্ণ খাদ্যের জলীয় অংশ শোষিত হয়। খাদ্যের যে অংশ জীর্ণ বা শোষিত হয় না, তাহা ক্রমে জীবাণু দ্বারা মলে পরিণত হয় এবং বৃহদন্ত্রের শেষভাগে মলভাণ্ডে (rectum) জমা হইয়া থাকে। পরে উহা সময়ে সময়ে মলদ্বার বা পায়ু (anus) দিয়া মলের আকারে বাহির হয়।

শ্বসন-তন্ত্র (Respiratory system)

শ্বাসকার্য বলিতে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ, এই উভয় কার্যই বুঝায়। শ্বাসগ্রহণ করিবার সময় আমরা বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং শ্বাসত্যাগের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কিছু জলীয় বাষ্প পরিত্যাগ করি।

শ্বসন-যন্ত্রাবলী—যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় তাহাদিগকে শ্বসন-যন্ত্রাবলী বলে। শ্বসন-যন্ত্র বলিতে (১) **নাসাপথ**, (২) **গলবিল**, (৩) **শ্বাসনালী**, (৪) **ফুসফুস** ও (৫) **মধ্যচ্ছদা** বুঝায়।

(১) **নাসাপথ** (Nares)—ইহা একটি ত্রিকোণ-গহ্বর বিশেষ। বাতাস নাসারন্ধ্র দিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা নাসাপথের আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া যাইবার সময় কিছু গরম হয় এবং বায়ুস্থিত ধূলিকণা নাসাপথের লোমে ও শ্লেষ্মা-ঝিল্লির আঠাল পদার্থের সহিত আটকাইয়া যায়। এইজন্য দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক ঠাণ্ডা বাতাস ও ধূলিকণা ফুসফুসে যাইতে পারে না।

(২) **গলবিল** (Pharynx)—নাসাপথ দুইটি জিহ্বার পিছনে মুখবিবরের যে স্থানে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাকে গলবিল বলে। ইহা শ্বাসনালী ও গ্রাসনালীর সংযোগস্থল। উভয় নালী গলবিলের নীচের অংশ হইতে আরম্ভ হইয়া দেহের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। শ্বাসনালী সামনের দিকে থাকে এবং উহার পিছনে গ্রাসনালী থাকে।

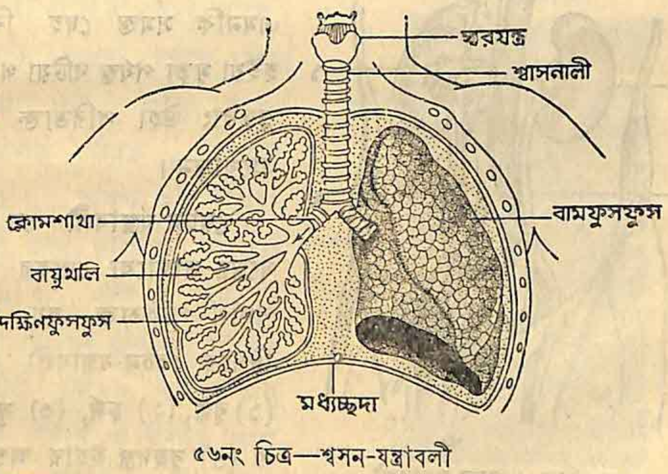
(৩) **শ্বাসনালী** (Trachea)—ইহার দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশকে **স্বরযন্ত্র** (larynx) বলে। আমরা ইহার সাহায্যে কথা বলি ও গান করি। শ্বাসনালী বক্ষঃপিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া একটি ডান দিকের ফুসফুসে ও অপরটি বাম ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদিগকে **ক্লোমশাখা** (bronchii) বলে। ইহারা প্রায়-গোলাকার তরুণাস্থি দিয়া গঠিত। ক্লোমশাখা কখনও চ্যাপ্টা হয় না, সর্বদা খোলা থাকে। ক্লোমশাখা ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নালিকায় বিভক্ত হইয়াছে ; ইহাদিগকে **ক্লোমপ্রশাখা** (bronchiole) বলে। পরে ইহারা বায়ুথলিতে উন্মুক্ত হইয়াছে।

(৪) **ফুসফুস** (Lungs)—বক্ষঃগহ্বরের ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুইপাশে দুইটি ফুসফুস আছে। একটিকে ডান ফুসফুস ও অপরটিকে বাম ফুসফুস বলে। ডান ফুসফুসটি অপেক্ষাকৃত বড়। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে ও বাম ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত।

প্রত্যেকটি খণ্ড আঙুরের থোকার মত অসংখ্য বায়ুথলি দ্বারা গঠিত। লক্ষ্য করিবে, ফুসফুস স্পঞ্জের মত ফাঁপা ও কোমল। প্রত্যেক ফুসফুসের চারিদিকে একটি পাতলা আবরণ আছে; এইজন্য ফুসফুস বেশী ফুলিয়া উঠিতে পারে না। বায়ুথলির গাত্র খুব সূক্ষ্ম; উহাতে অসংখ্য জালক-নালী আছে। এই জালক-নালীর ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় উহা বায়ুথলি হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং উহাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে।

(৫) **মধ্যচ্ছদা**—ইহা মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত পর্দা বিশেষ। এই পর্দা বক্ষঃগহ্বর ও উদর-গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত ও পাঁজরার সহিত সংযুক্ত। ইহা দেখিতে একটি খোলা ছাতার মত।

শ্বাসকার্য—শ্বাসগ্রহণের সময় মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরার পেশীগুলি সংকুচিত হইবার ফলে বক্ষঃগহ্বরের আয়তন বড় হয়। এইভাবে



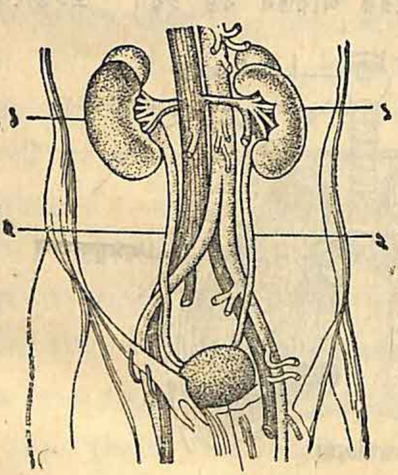
৫৬নং চিত্র—শ্বসন-যন্ত্রাবলী

বক্ষঃগহ্বরের প্রসারণের ফলে ফুসফুসও প্রসারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের বাতাস নাসাপথ ও মুখবিবর দিয়া ফুসফুসের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া উহার বায়ুথলিগুলি পূর্ণ করে। পরক্ষণে মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরার পেশীগুলি প্রসারিত হয়। ফলে বক্ষঃগহ্বরের আয়তন কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস সংকুচিত হয়। ইহার ফলে ফুসফুসের বায়ুথলি হইতে দূষিত বাতাস বাহির হইয়া আসে। এইভাবে মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরার পেশীর পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ফুসফুস একবার প্রসারিত ও একবার সংকুচিত হয়। এইরূপে আমাদের শ্বাসকার্য সাধিত হইয়া থাকে। ফুসফুসের এই কার্য দিবারাত্র অবিরাম চলিতেছে। সুস্থাবস্থায় আমাদের শ্বাসকার্য এক মিনিটে সাধারণতঃ ১৮ বার হইয়া থাকে।

রেচন-যন্ত্র (Excretory system)

খাদ্য দেহসাৎ হইবার সময় দেহের ভিতরে অনেক দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই সকল দূষিত পদার্থ দেহের মধ্যে জমা হইলে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়, এমনকি সমস্ত দেহ বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হওয়া প্রয়োজন।



৫৭নং চিত্র—রেচন-যন্ত্রাবলী
(১) বৃক্ক ; (২) গবিনী ; (৩) মূত্রাশয়

রেচন-যন্ত্রাবলী—যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে দেহের দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয় তাহাদিগকে রেচন-যন্ত্রাবলী বলে। (১) বৃক্ক, (২) চর্ম, (৩) ফুসফুস ও (৪) বৃহদন্ত্র ইহার অন্তর্গত।

(১) **বৃক্ক** (Kindey)—উদর-গহ্বরের পিছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক্ক

অবস্থিত। ইহা দেখিতে দ্বিখণ্ডিত বরবটির বীজের মত। ইহার বর্ণ পিংগল। প্রত্যেক বৃক্ক দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২ ইঞ্চি। ইহার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূত্রনালী আছে। প্রত্যেক নালীর মুখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী ও শিরা ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। এই সূক্ষ্ম মূত্রনলগুলি রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ এবং উদ্বৃত্ত জল গ্রহণ করে। পরে উহা দুইটি বড় নল দিয়া মুত্রাশয়ে (bladder) আসিয়া জমা হয়। এই নল দুইটিকে গবিনী (ureter) বলে। মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ হইলেই আমরা প্রস্রাবের বেগ অনুভব করিয়া থাকি এবং মূত্রনালী (urethra) দিয়া উহা দেহ হইতে বাহির হয়।

(২) **চর্ম** (Skin)—চর্মও একপ্রকার রেচন-যন্ত্র বিশেষ। ইহাতে প্রধানতঃ দুইটি স্তর আছে—(১) কৃত্তিক (Epidermis) ও (২) **অন্তস্তক** (Dermis)। চর্মের উপরিভাগকে কৃত্তিক বলে। কৃত্তিকের বাহিরের অংশে অসংখ্য চ্যাপ্‌টা কোষ আছে; ইহারা সময়ে সময়ে শক্ত হইয়া নখ গঠন করে। কৃত্তিকের নীচে অন্তস্তক থাকে। অন্তস্তকেই শিরা, ধমনী, স্নায়ু, ঘর্মগ্রন্থি (sweat gland) এবং স্বেদগ্রন্থি (sebaceous gland) আছে। ঘর্মগ্রন্থি দেহের নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ ও জলীয় অংশ সংগ্রহ করে এবং পরে



৫৮নং চিত্র—চর্মের ছেদ

লোমকূপ দিয়া ঘর্মরূপে বাহির করিয়া দেয়। লোমকূপ বন্ধ

হইলে দেহের দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না। এইজন্য চর্ম সর্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

(৩) **ফুসফুস** (Lungs)—ফুসফুস সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার সাহায্যে দেহ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প পরিত্যাগ করে।

(৪) **বৃহদন্ত্র** (Large intestine)—বৃহদন্ত্র সম্বন্ধেও তোমাদের পূর্বে বলিয়াছি। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলে উহার সার অংশ গৃহীত হয় এবং অসার অংশ বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থানে উহার জলীয় অংশ শোষিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ মলদ্বার বা পায়ু (anus) দিয়া বাহির হইয়া যায়।

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি

(Some common diseases)

(১) ম্যালেরিয়া (Malaria)

তোমরা নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া রোগের কথা শুনিয়াছ। একপ্রকার পরজীবী * (Parasite) জীবাণু দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি হয়। এনোফেলিস নামক একজাতীয় মশক এই জীবাণুর বাহক। এই মশক ম্যালেরিয়ার জীবাণু রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত করে।

ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণ—যখন এনোফেলিস মশক কোন ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত ব্যক্তির দেহ হইতে শুঁড় দিয়া রক্ত শোষণ করে, তখন রক্তের সহিত ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুও উহার পেটের মধ্যে চলিয়া যায়। এই সকল জীবাণু ১০-১২ দিন পেটের মধ্যে

*ম্যালেরিয়ার জীবাণু রোগীর দেহ হইতে বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে আশ্রয়লাভ করিতে না পারিলে বাহিরে বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারে না। এই কারণে ইহাকে পরজীবী বলে।

থাকিয়া ক্রমশঃ বড় হয় এবং প্রত্যেক জীবাণু বিভক্ত হইয়া অনেক ছোট ছোট জীবাণুতে পরিণত হয়। পরে ইহারা পেট হইতে চলিয়া আসিয়া শুঁড়ের কাছে থাকে। পুনরায় ঐ মশক যখন কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন শুঁড়ের মধ্য দিয়া ঐ সকল ম্যালেরিয়ার জীবাণু দষ্ট ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিবামাত্র রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে আশ্রয় লয় এবং ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। শেষে প্রত্যেক জীবাণু বিভক্ত হইয়া অনেক ছোট ছোট জীবাণুর সৃষ্টি হয়। পরে লোহিত কণিকা ফাটিয়া ঐ সকল জীবাণু রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। যখন জীবাণু রক্তস্রোতের সহিত মিশে তখনই ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রোগের লক্ষণ—ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া ও শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জ্বর হয়। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয় এবং বমন হয়। দেহের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ে এবং কিছুক্ষণ পরে প্রচুর ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। সাধারণতঃ জ্বর প্রত্যহ বা পালা করিয়া ১-২ দিন অন্তর একই সময়ে আসে। অনেক দিন জ্বরে ভুগিলে দেহ রক্তশূন্য ও দুর্বল হয় এবং প্লীহা ও যকৃৎ বড় হয়।

রোগের প্রতিকার—ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে উহার বাহক এনোফেলিস মশক নির্মূল করিতে হইবে। মশা দিনের বেলায় বন-জংগল ও ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এইজন্য গ্রামের বন-জংগল ও ঝোপ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। এইজন্য বাড়ীর নিকটের খানা, ডোবা, গর্ত প্রভৃতি ভরাট করিতে হইবে। যে সকল জলাশয় ভরাট করা সম্ভবপর নয়, তাহাতে সপ্তাহে একবার করিয়া কেরোসিন তৈল অথবা ডি.ডি.টি. নামক একপ্রকার ঔষধ ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে জলের উপর যে পাতলা আবরণ পড়িবে তাহা ভেদ করিয়া মশার বাচ্চাগুলি

জলের উপর হইতে বাতাস লইতে না পারিয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল বড় পুকুরের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহাতে কখনও কেরোসিন তৈল ছড়াইবে না। ইহাতে কই, খলিসা, তেচোকা প্রভৃতি মাছ ছাড়িতে হইবে। ইহারা মশার বাচ্চা খাইতে খুব ভালবাসে।

মশার দংশন হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঘরের মধ্যে ধূপ, ধূনা প্রভৃতি দ্রব্য পোড়াইতে হইবে। ইহাতে মশা ধোঁয়া সহ্য করিতে না পারিয়া ঘর হইতে পলাইয়া যাইবে। রাত্রিতে মশারির মধ্যে শয়ন করিতে হইবে। মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

সাধারণতঃ বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় সকলেরই সপ্তাহে ১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়া উচিত।

(২) বসন্ত (Small pox)

বসন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ইহা ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে। বসন্তের জীবাণু বা ভাইরাস (virus) এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও উহাকে দেখা যায় না। বসন্ত রোগীর শ্লেষ্মায়, ক্ষতের রসে, গুটির মামড়িতে ও শুশ্রূষাকারীদের বস্ত্রে রোগের জীবাণু থাকে। সুস্থ ব্যক্তিরা উহার সংস্পর্শে আসিলেই এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় মাছি ও বায়ুর দ্বারা এই রোগের বিস্তার হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ—এই রোগের সূচনায় সারা দেহ জ্বালা, কোমরে ও মাথায় বেদনা এবং মুখ-চোখ লাল হইয়া কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হয়। তিন দিনের দিন রোগীর কপালে, ঘাড়ে ও কব্জিতে লাল ঘামাচির মত গুটি দেখা দেয়। গুটি ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে বাহির হয়। গুটিগুলির চারিদিক লাল হইয়া উঠে। পাঁচ-ছয় দিনে ঐগুলি জলে ভরিয়া উঠে

এবং সাত-আট দিনে গুটি পাকিয়া পুঁজ (pus) দেখা দেয়। পরে গুটিগুলি ক্ষতে পরিণত হয়। ক্ষত শুকাইবার সময় উহার উপর মামড়ি পড়ে। এই মামড়িগুলি ক্রমশঃ শুকাইয়া খসিয়া ।পড়ে এবং এই সময় রোগের সংক্রমণের বিশেষ আশংকা থাকে।

রোগের প্রতিকার—বসন্ত রোগীকে পৃথক্ ঘরে রাখিতে হইবে। ঘরে যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ উহারা এই রোগের জীবাণুর প্রধান বাহক। এইজন্য রোগীকে সর্বদা মশারির মধ্যে রাখিবে এবং ঘরে সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ-ধূনা পোড়াইবে। ক্ষত শুকাইবার সময় উহাতে তিল অথবা জলপাইয়ের তৈল লাগাইতে হইবে। কারণ ক্ষতের মামড়ি তৈলাক্ত হওয়ার ফলে উহা বাতাসে উড়িতে পারিবে না ও রোগের জীবাণুও ছড়াইয়া পড়িবে না। রোগীর কফ, থুথু এবং গুটির মামড়ি যেখানে-সেখানে ফেলিবে না এবং উহা বিশোধক ঔষধে (disinfectant) মিশাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা গর্তের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র প্রভৃতি বিশোধক ঔষধে কয়েক ঘণ্টা ডুবাইয়া গরম জলে ভাল করিয়া ধুইবে। কখনও রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য ব্যবহার করিবে না এবং উহার সংস্পর্শে আসিবে না। রোগীর শুশ্রূষাকারীদের খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে হইবে এবং হাত-পা ফরম্যালিন (formalin) বা অন্য কোন বিশোধক ঔষধে ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। মামড়িগুলি যতদিন পর্যন্ত সব উঠিয়া না যায় ততদিন রোগীকে ঘর হইতে বাহির



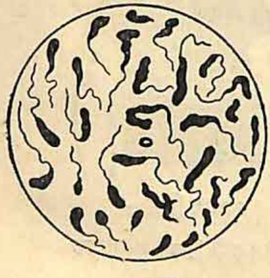
৫৯নং চিত্র—
বালকটি টিকা লইয়াছে

হইতে দিবে না। বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার একটিমাত্র উপায় টিকা (vaccination) লওয়া। টিকা লইলে বসন্ত হয় না, যদি বা হয় তত মারাত্মক হয় না।

(৩) কলেরা (Cholera)

কলেরা একটি ভয়াবহ সংক্রামক রোগ। প্রতি বৎসর এই রোগে কত লোক যে মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রোগের কারণ হইতেছে এক প্রকার জীবাণু। এই জীবাণু কমা (,) চিহ্নের মত দেখিতে বলিয়া ইহাকে কমা ব্যাসিলাস (coma bacillus) বা কমা জীবাণু বলে। পানীয় জল বা খাদ্যের সহিত এই জীবাণু উদর-মধ্যে প্রবেশ করিলে কলেরা হয়। কলেরা রোগীর বমিতে ও মলে এই জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে।

রোগের সংক্রমণ—কলেরার জীবাণু মাছি ও জলের সাহায্যে ছড়াইয়া পড়ে। মাছি যখন কলেরা রোগীর মলে ও বমিতে বসে, তখন উহার দেহে (বিশেষতঃ পায়ে ও ডানায়) কলেরার জীবাণু লাগিয়া যায়। পরক্ষণে উহা যখন খাবারের উপর বসে তখন উহার দেহ হইতে কলেরার জীবাণুগুলি খাবারের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই দূষিত খাবার খাইলে কলেরা হয়।



৬০নং চিত্র—
কলেরার জীবাণু

অনেকে কলেরা রোগীর বমি ও মল-মাখান কাপড়-চোপড় পুকুরের জলে ধুইয়া থাকে। ইহাতে জল কলেরা রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়। এই দূষিত জল পান করিলে বহুলোক এককালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

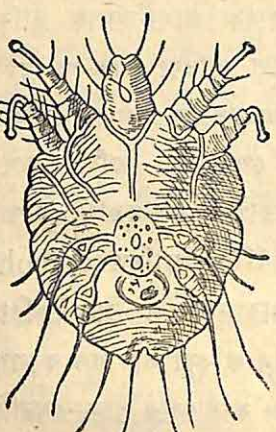
রোগের লক্ষণ—এই রোগের সূচনায় অনবরত বমন ও চাউল ধোয়া জলের মত দাস্ত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে নাড়ী অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে এবং চোখ ও মুখ বসিয়া যায় এবং ওষ্ঠ নীল হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতে-পায়ে খিল ধরায় রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকে। দেহ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। রোগীর স্বরভংগ ও অত্যধিক পিপাসা হইয়া থাকে। প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

রোগের নিবারণ—কলেরা রোগীকে পৃথক্ ঘরে রাখিতে হইবে। শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও রোগীর ঘরে থাকিতে দিবে না। তিনি যখন বাহিরে আসিবেন তখন তাঁহাকে জামা-কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে হইবে এবং বিশোধক ঔষধে ভাল করিয়া হাত-পা ধুইতে হইবে। কলেরা রোগীর মল ও বমি কদাচ যেখানে-সেখানে ফেলিবে না। উহাতে বিশোধক ঔষধ মিশাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা গর্তের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে। কলেরা রোগীর মল-মূত্রাদি মাখান কাপড়-চোপড় লাইসল (lysol) অথবা কার্বলিক অ্যাসিড (carbolic acid) দ্বারা শোধিত করিয়া সোডা বা সাবান জলে সিদ্ধ করিয়া কাচিতে হইবে। যে জলাশয়ের জল পান করিয়া কাহারও কলেরা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবে সেই জল কাহাকেও পান, এমনকি স্পর্শ করিতে দিবে না। মাছি যাহাতে রোগ ছাড়াইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর বাড়ীতে বা তাহার আশে-পাশে কোন আবর্জনা জমিতে দিবে না। বাড়ীতে এবং নর্দমা ও পায়খানায় ব্লিচিং পাউডার (bleaching powder) ছড়াইয়া দিবে। খাবার জিনিস ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। বাজারের কোন খাবার কদাচ খাইবে না। পানীয় জল ও দুধ ভাল করিয়া ফুটাইয়া পান করিবে, ইহাতে কলেরার জীবাণু নষ্ট হইয়া যাইবে। কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিলে খালি পেটে থাকিবে না। টক

জিনিসে জীবাণু নষ্ট হয়, সুতরাং তখন দই খাওয়া ভাল। ইহা ব্যতীত কলেরা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলেরার টিকা (inoculation) লওয়া আবশ্যক। কলেরা হইতে রক্ষা পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

(৪) খোস-পাঁচড়া (Scabies)

খোস-পাঁচড়া একপ্রকার সংক্রামক চর্মরোগ। একপ্রকার কীটের দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। কীট চর্মের উপরের স্তর ভেদ করিয়া উহার নীচে সুড়ংগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাস করে ও ডিম পাড়ে। ডিম হইতে নূতন কীট জন্মায়। যেখানে কীট প্রবেশ করে সেই স্থানটি চুলকায় এবং সেইখানে একটি ছোট গুটি দেখা দেয়। পরে এই গুটির মধ্যে পুঁজ উৎপন্ন হয়। পুঁজ ও রসের সহিত অনেক কীট থাকে। সুতরাং সেই পুঁজ বা রস কাহারও গায়ে লাগিলে তাহারও ঐ রোগ হয়। রোগীর ব্যবহৃত গামছা, কাপড় প্রভৃতির দ্বারাও রোগ ছড়াইয়া পড়ে। চুলকাইবার সময় নখের দ্বারা কীট অপর স্থানে সংক্রমিত হয়।



৬১নং চিত্র—খোসের কীট

রোগের নিবারণ—সাধারণতঃ অপরিচ্ছন্ন ছেলে-মেয়েদের এই রোগ হইয়া থাকে এবং উহাদের সংস্পর্শে রোগের বিস্তার ঘটে। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে এবং হাতের নখ ছোট করিয়া কাটিলে এই রোগ নিবারিত হয়। চর্মরোগগ্রস্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবে না বা উহার ব্যবহৃত কাপড়-গামছা ব্যবহার

করিবে না। প্রতিদিন ভাল করিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিবে। পাঁচড়া হইলে আক্রান্ত স্থানগুলি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে ও গরম জলে কার্বলিক সাবান দিয়া ধুইবে। পরে গন্ধকের মলম, নিমের মলম, চালমুগরার তেল প্রভৃতি লাগাইবে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য (Accidents and first-aids)

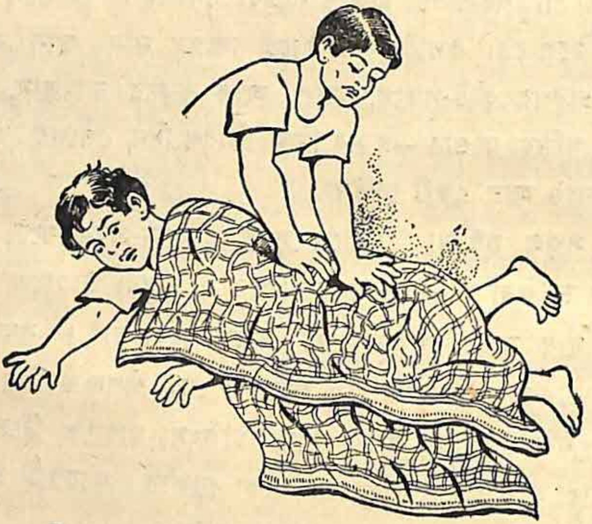
যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও আমাদের জীবনে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। বাড়ী হইতে সুস্থ দেহে বাহির হইলাম, হঠাৎ কলার খোসার উপর পা পড়িয়া পা পিছলাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। সেখানে ভাঙা কাচ থাকিলে তো কথাই নাই, কাচে দেহের নানা স্থান কাটিয়া গেল। তারপর কীট-পতংগ, সাপ আর কুকুরে কামড়ান, হঠাৎ খানিকটা পুড়িয়া যাওয়া—এ সব নিত্য তিরিশ দিন লেগেই আছে। জলে ডোবাও আর একটি দুর্ঘটনা।

এই সকল দুর্ঘটনা যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘটে, তখন চিকিৎসক ডাকিয়া আনিবার সময়ও থাকে না অথবা তাঁহাকে সহসা পাওয়াও যায় না। অথচ একটা ব্যবস্থা করা চাই। যথাসময়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা করিতে পারিলে হয়ত' সহজেই বিপদ কাটিয়া যায়। এইজন্য দুর্ঘটনা ঘটিলে তার প্রথম চিকিৎসা যাহাতে নিজেদেরই করিতে পারা যায় তজ্জন্য কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। কয়েকটি দুর্ঘটনা আর তার প্রাথমিক সাহায্যের কথা বলা হইল।

(১) আগুনে পোড়া (Burns)

দেহের কোন অংশ দুই রকমে পুড়িয়া যাইতে পারে—আগুন, জ্বলন্ত বস্তু বা বিদ্যুতের সংস্পর্শে অথবা গরম বাষ্প, ফুটন্ত জল, দুধ প্রভৃতি তরল পদার্থ পড়িয়া।

কোন ব্যক্তির কাপড়ে আগুন লাগিলে প্রথমেই উহা নিভাইবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাকে ছুটাছুটি করিতে দিবে না, কারণ ইহাতে আগুন আরও বেশী জ্বলিয়া উঠিবে। লজ্জা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড়-জামা খুলিয়া ফেলিবে। যদি কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধা থাকিবার জন্য খোলা সম্ভব না হয় তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তাছাড়া কম্বল, লেপ, তোষক প্রভৃতি কোন পুরু দ্রব্য দিয়া চাপা দিলেও আগুন সহজে নিভিয়া যায়। যদি নিকটে এই সকল বস্তু পাওয়া না যায় তবে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হইবে।



৬২নং চিত্র—কাপড়ে আগুন লাগিলে এইভাবে চাপা দিতে হইবে।

ইহাতেও আগুন নিবিয়া যায়। ঠাণ্ডা জল দিয়া কখনও আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবে না।

আগুন নিভাইবার পর দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। যদি দগ্ধ স্থানে কাপড় আটকাইয়া থাকে তাহা হইলে কখনও কাপড় টানিয়া তুলিবে না, উহার চারি পাশ কাটিয়া ফেলিবে।

ফোস্কা পড়িলে উহা কখনও গালিয়া দিবে না, তাহা হইলে ক্ষত সারিতে অনেক দেরী হইবে। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীর জ্বালা সাময়িকভাবে কমাইবার জন্য দগ্ধ স্থানে স্পিরিট বা সমান পরিমাণে নারিকেল তৈল ও চুন মিশাইয়া লাগান যাইতে পারে। ক্ষত স্থান কখনও খোলা রাখিবে না। খুব সাবধানে তূলা ও পরিষ্কার কাপড় ক্ষত স্থানে আল্‌গাভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত। পরে চিকিৎসক আসিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

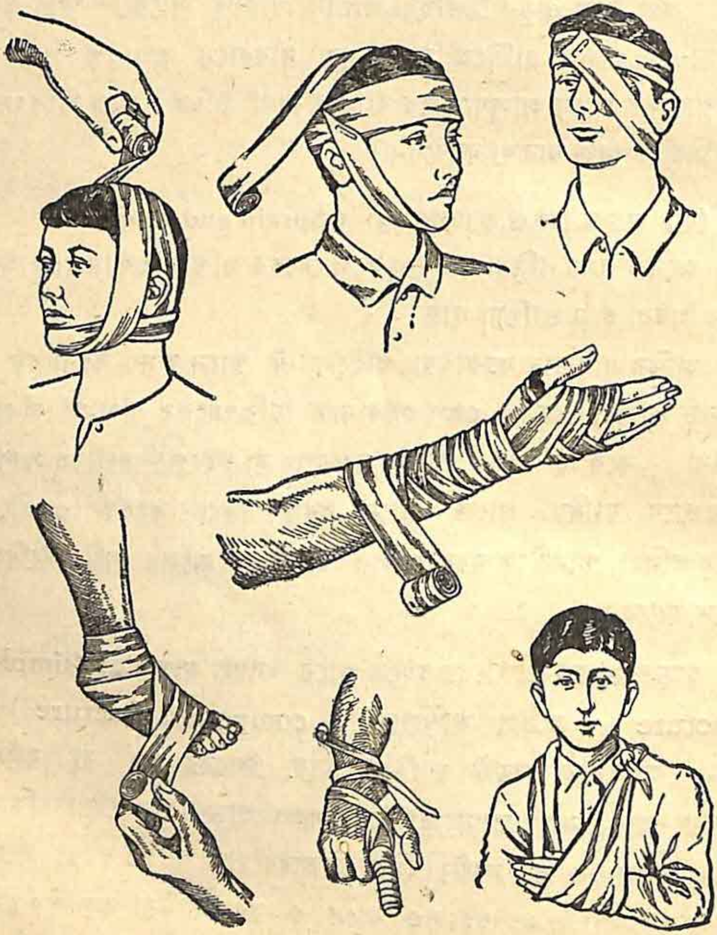
(২) মচকান ও হাড়ভাঙা (Sprain and fracture)

অনেক সময় পড়িয়া যাইবার ফলে দেহের অস্থি-সন্ধিস্থান মচকাইয়া যায় অথবা হাড় ভাঙিয়া যায়।

অস্থির সন্ধিস্থান মচকাইয়া যাইলে ঐ স্থানে অসহ্য যন্ত্রণা হয় ও স্থানটি ফুলিয়া উঠে। এরূপ হইবামাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। তবে চিকিৎসক পাওয়া সম্ভবপর না হইলে, রোগীকে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে রাখিয়া আহত স্থানে বরফ দিয়া কয়েকবার ধীরে ধীরে ঘষিয়া স্থানটিতে বরফ জলের বা ঠাণ্ডা জলের পটি বাঁধিয়া দিতে হইবে।

হাড়ভাঙা দুই প্রকারের হইতে পারে—**সরল হাড়ভাঙা** (simple fracture) ও **জটিল হাড়ভাঙা** (compound fracture)। যখন কেবলমাত্র হাড়টি ভাঙিয়া যায়, উপরের ত্বক বা মাংস ফাটিয়া যায় না, তখন তাহাকে সরল হাড়ভাঙা বলে। কিন্তু যখন মাংস ও ত্বক ফাটিয়া গিয়া ভিতরের হাড় বাহির হইয়া পড়ে অথবা হাড় বাহির না হইলেও মাংস ও ত্বক ফাটিয়া রক্তপাত হয় তখন তাহাকে জটিল হাড়ভাঙা বলে। হাড়ভাঙা যে প্রকারের হউক না কেন সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাসপাতালে বা উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাওয়া কর্তব্য, কারণ হাড়ভাঙার চিকিৎসা অতি

কঠিন ব্যাপার। তবে তৎক্ষণাৎ ইহা সম্ভবপর না হইলে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীকে কোনরূপ নাড়ানাড়া করিবে না। রোগীকে চারিদিকে বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত



৬৩নং চিত্র—নানাপ্রকার ব্যাণ্ডেজ-বন্ধন প্রণালী

যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাবধানে রোগীর কাপড়-চোপড় বদল করিতে হইবে। যদি রক্তপাত হইতে থাকে

তাহা হইলে ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহার চারিদিকে টিংচার আয়োডিন (tincture iodine) লাগান উচিত। বেশী রক্তস্রাব হইলে বরফ দিতে হইবে ও পরে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিয়া ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে। শেষে খুব সাবধানে আঘাতপ্রাপ্ত অংগটিকে যথাসম্ভব সোজা করিয়া রাখিয়া কাঠের টুকরা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার বিভিন্ন প্রণালী ৬৩নং চিত্রে দেখান হইল।

(৩) কাটিয়া যাওয়া ও রক্ত পড়া (Cut including hæmorrhage)

দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। সামান্য কাটাজনিত রক্তস্রাব সাধারণতঃ খুব গুরুতর হয় না। কেবলমাত্র টিংচার আয়োডিন বা টিংচার বেনজোইন (tincture benzoine) নামক ঔষধ পরিষ্কার তূলায় ভিজাইয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া রাখিলেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

বেশী রক্তস্রাব বিপজ্জনক। সুতরাং প্রথমেই উহা বন্ধ করা কর্তব্য। ক্ষত স্থানে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিয়া চাপিয়া বাঁধিলেই অধিকাংশ স্থলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ইহাতে রক্ত পড়া বন্ধ না হইলে ক্ষত স্থানের উপরে বা নীচে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে রক্ত বন্ধ হইবেই। হাত দিয়া চাপ দিলে যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তাহা হইলে একখণ্ড কাপড় দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে। গভীর ক্ষত হইয়া ধমনী কাটিয়া রক্তস্রাব হইলে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত ফিনকি দিয়া দমকে দমকে বাহির হয়। তখন ক্ষত স্থানের উপরের দিকে চাপ দিতে হইবে। শিরা কাটা যাইলে ঈষৎ নীলাভ রক্ত একটানা বাহির হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষত স্থানের নীচের দিকে চাপিয়া ধরিতে হইবে।

ক্ষত সামান্য বা গভীর যাহাই হউক না কেন, উহা যাহাতে দূষিত না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ সামান্য ক্ষতও দূষিত হইয়া মৃত্যুর কারণ হয়। এইজন্য কাটিয়া গেলে ক্ষত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া টিংচার আয়োডিন লাগাইতে হইবে। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া অ্যান্টি-টিটেনাস (anti-tetanus) বা ধনুষ্টংকার-বিরোধী ইনজেকশন লওয়া ভাল।

(৪) জলে ডোবা ও কৃত্রিম শ্বাসকার্য (Drowning and artificial respiration)

জলে ডোবা আমাদের দেশে একটি সাধারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা। জলে সাঁতার না জানিবার জন্য বা সাঁতার দিতে গিয়া হঠাৎ হাত-পা অবশ হইয়া অথবা নৌকাডুবি প্রভৃতি কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

এই রকমের বিপদে প্রথম কর্তব্য হইতেছে জলমগ্ন ব্যক্তির ফুসফুস ও পেট হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া। পরে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বশেষে রোগীর দেহের উত্তাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জল নিষ্কাশন—জলমগ্ন ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব জল হইতে তুলিয়া এক টুকরা পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে নাকের ও মুখের ভিতরের ময়লা বাহির করিয়া দিতে হইবে। পরে রোগীর পা দুইটি ধরিয়া দেহটি ঝুলাইয়া মাথা নীচের দিকে করিলে পেটের ভিতরের কিছুটা জল বাহির হইয়া যাইবে।

'সেফার পদ্ধতি' অনুসারে কৃত্রিম শ্বাসকার্য—যথাসম্ভব জল বাহির করিবার পর রোগীর কোমরের কাপড় আলগা করিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হইবে। এখন রোগীর মাথাটি একপাশে কাত করিয়া দাও এবং উহার বুকের নীচে একটি বালিশ

অভাবে কাপড়ের বা জামার বাণ্ডিল রাখ। এইবার হাঁটু গাড়িয়া একপাশ হইয়া উভয় পার্শ্বে পা রাখিয়া রোগীর দিকে মুখ করিয়া বসিতে হইবে। এইভাবে বসিয়া দুই হাত রোগীর কোমর ও পিঠের উপর রাখিয়া সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাপ দাও। তারপর হাত না সরাইয়া আবার ধীরে ধীরে নিজের দেহটিকে সোজা কর। মনে রাখিও, তুমি যখন রোগীর পিঠে ও কোমরে চাপ



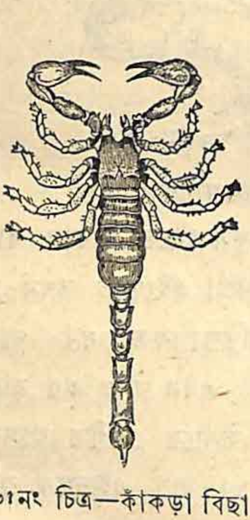
৬৪নং চিত্র—সেফার পদ্ধতিতে কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালনা

দিতেছ তখন মধ্যচ্ছদা উপরে উঠিয়া ফুসফুস হইতে বাতাস বাহির করিয়া দিতেছে ; আবার তুমি যখন সোজা হইতেছে তখন চাপ সরিয়া যাওয়ায় এবং ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম থাকায় ফুসফুসের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতেছে। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা তুমি কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাসকার্য চালাইতেছ। প্রতি মিনিটে গড়ে ১৪-১৫ বার এইভাবে কৃত্রিম শ্বাসকার্য প্রায় ½ ঘণ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। অবশেষে রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্য আরম্ভ হইবে। যদি তাহা না হয়, হতাশ হইবে না। এমনও দেখা গিয়াছে, ২-২½ ঘণ্টা পরে শ্বাসকার্য আরম্ভ হইয়া রোগী জীবন পাইয়াছে। অবশ্য এই কার্যে একজন পরিশ্রান্ত হইলে তাহার স্থানে অপর লোককে বসিতে হইবে।

দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি—শ্বাসকার্য আরম্ভ হইলে উক্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে। এখন দেহের উত্তাপ ও রক্ত চলাচল বৃদ্ধি দরকার। রোগীর দেহ গরম কাপড় বা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। গরম জলের বোতল বা রবারের থলিতে গরম জল ভরিয়া পেটে, বগলে ও পায়ের তলায় সেক দিবে। যখন দেখিবে রোগী গিলিতে পারিতেছে তখন গরম দুধ, চা অথবা গরম জলের ব্রাণ্ডি মিশাইয়া ধীরে ধীরে চামচ দিয়া খাওয়াইয়া দিবে। সাবধান, রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া করিও না। ইতিমধ্যে চিকিৎসক আসিয়া ভার লইবেন।

(৫) বৃশ্চিক দংশন (Bite of scorpions)

বিছার লেজের আগায় হুল থাকে। এই হুলে একপ্রকার তীব্র বিষ থাকে। এইজন্য কাহারও গায়ে হুল ফুটাইয়া দিলে ক্ষত স্থান বিষাক্ত হইয়া যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় এবং ঐ স্থান ফুলিয়া উঠে। কোন কোন সময় যন্ত্রণা এত তীব্র হয় যে তাহাতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

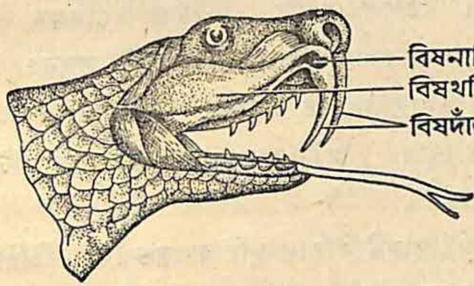


৬১নং চিত্র—কাঁকড়া বিছা

বিছা কামড়াইলে, প্রথমে ক্ষত স্থানে হুল বিদ্ধ আছে কিনা দেখিতে হইবে। যদি হুল বিদ্ধ থাকে তবে একটু সরু চিমটা দিয়া অথবা একটি বড় চাবির গর্তের মুখ ক্ষত স্থানে চাপিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। তারপর ক্ষত স্থানে গরম জল, বরফ, চুন, নিশাদল দ্রব, কার্বলিক অ্যাসিড, কোকেন-দ্রব প্রভৃতি লাগাইবে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে জলমিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি খাইতে দিবে। ইহার পর চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া ভাল

(৬) সর্প দংশন (Bite of snake)

সাপ বড় মারাত্মক জীব। আমাদের দেশে সাপের কামড়ে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কতক সাপ (যেমন—কেউটে, গোখুরা, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি) বিষধর কিন্তু এমন অনেক সাপ আছে যাহারা নির্বিষ। বিষধর সাপের চোয়ালে অপেক্ষাকৃত সামনের দিকে দুইটি লম্বা সূচাল বিষদাঁত থাকে। এই বিষদাঁতের পিছনে বিষের থলি আছে। কামড়াইবার সময় ঐ থলি হইতে তরল



৬৬নং চিত্র—সাপের মুখ

বিষদাঁতের গর্ত দিয়া বাহির হইয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া মৃত্যু ঘটায়। নির্বিষ সাপ কামড়াইলে কিছুই হয় না। তবে অনেকে ভয় পাইয়া মারা যায়। মনে রাখিও, বিষধর সাপ কামড়াইলে দষ্ট স্থানে পর পর দুইটি দাঁতের দাগ [০০] থাকে এবং নির্বিষ সাপ কামড়াইলে দষ্ট স্থানে চারিটি দাগ [ঃঃ] থাকে।

সর্পদংশনের লক্ষণ—কেউটে বা গোখুরা সাপে কামড়াইলে ভীষণ জ্বালা করিতে থাকে ও দষ্ট স্থানটি লাল হইয়া উঠে। দেহে বিষ ছড়াইয়া পড়িলে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং হাত, পা, ঠোঁট ও জিভ অবশ হইয়া মুখ দিয়া লালা ঝরিতে থাকে এবং সর্ব দেহ বিবর্ণ

6681 S.I.B/9479

হইবে। আজকাল পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Pasteur Institute) স্থাপিত হইয়াছে; সেখানে জলাতংক রোগের চিকিৎসা হয়। কলিকাতায় পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ "স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন"-এ অবস্থিত।

প্রশ্ন

১। জীব ও জড় কাহাকে বলে? জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ২। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কি? ৩। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা কর। ৪। মটর গাছের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের ফলাফল বর্ণনা কর। ৫। নিম্নলিখিত যে কোন একটি জীবের কথা আলোচনা কর :—

(ক) ঈষ্ট্, (খ) অ্যামিবা, (গ) মস্।

৬। মানবদেহ প্রধানতঃ কি কি উপাদানে গঠিত? দেহে মোট কয়খানি হাড় আছে? ৭। খাদ্য মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত কোন্ পথে যায়, এবং কোন্ অংশে খাদ্যের কি কি পরিবর্তন হয় তাহা বুঝাইয়া দাও। ৮। রেচন-তন্ত্র বলিতে কি বুঝায়? দেহের আবর্জনা নিষ্কাশনে বৃক্ক ও চর্ম কিভাবে সাহায্য করে? ৯। কিভাবে আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমিত হয় এবং কি উপায়ে এই রোগের প্রতিকার করা সম্ভব তাহা বিশদ্‌ভাবে আলোচনা কর। ১০। বসন্ত রোগের লক্ষণ কি? এই রোগ হইতে পরিত্রাণের সর্বপ্রধান উপায় কি? ১১। কলেরা রোগের লক্ষণ কি? এই রোগ নিবারণের উপায় কি? ২২। নিম্নলিখিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় কি কি প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়—

(ক) আগুনে পোড়া, (খ) অতিরিক্ত রক্তপাত, (গ) বৃশ্চিক বা সর্প দংশন।

১৩। কৃত্রিম শ্বাসকার্যের সাহায্যে কিরূপে জলমগ্ন ব্যক্তিকে বিপন্মুক্ত করা যায়? ১৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ—

মজ্জা, টায়ালিন, মধ্যচ্ছদা, পরজীবী জীবাণু।

Basic Training College, Banipur, 24-Pgs.
C.B.R.S., West Bengal Library

STATE INSTITUTE OF EDUCATION * Govt. of West Bengal *

Approved by the Board of Secondary Education,
West Bengal

ডাঃ স্নেহময় দত্ত ও শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

সরল বিজ্ঞান ১ম—(৬ষ্ঠ শ্রেণী)

সরল বিজ্ঞান ৩য়—(৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

শ্রীমনোমোহন রায়চৌধুরী প্রণীত

প্রবেশিকা জ্যামিতি—(৭ম-৮ম, ৭ম-১০ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণী)

সহজ বীজগণিত—(৭ম-৮ম, ৭ম-১০ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণী)

গণিত প্রবেশিকা [ঐচ্ছিক]—(৯ম ও ১০ম শ্রেণী)

ডাঃ ডি. এন্. মল্লিক প্রণীত

পাটীগণিত—(৭ম-৮ম, ৭ম-১০ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণী)

Books for Higher Secondary Course

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও
শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক সরল বিজ্ঞান ১ম—(৬ষ্ঠ শ্রেণী)

ডাঃ স্নেহময় দত্ত ও শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক সরল বিজ্ঞান ২য়—(৭ম শ্রেণী)

" " " " ৩য়—(৮ম শ্রেণী)

" " " " ৪র্থ—(৯ম শ্রেণী)

" " " " ৫ম—(১০ম শ্রেণী)